উত্তরণ

শারদ সংখ্যা

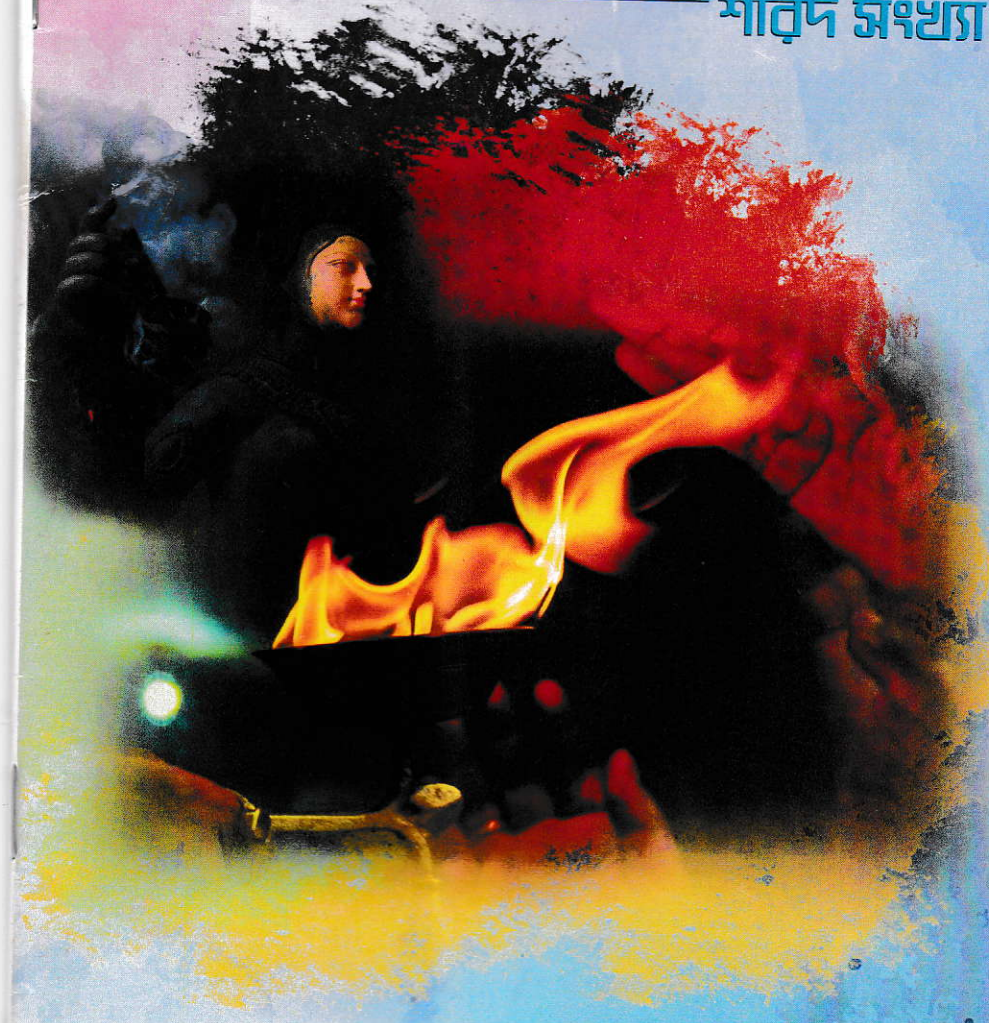

Growing SEED

"Live peacefully and let live others peacefully"

৭ম বর্ষ

উত্তরন

শারদ সংখ্যা - ২০১৭

Gift Copy
NOT FOR SALE

Growing Seed, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা
ই-মেল : seedgrowing@gmail.com
ফেসবুক : facebook.com/growingseedinfo
লগঅন করুন : www.growingseedsociety.webs.com
টুইটার : @growingseed1

(বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের নয়।)

UTTARAN
Edited by : Growing Seed
₹ 20

সপ্তম প্রকাশ :
২৬-০৯-২০১৭

প্রকাশ :
Growing Seed Printing Unit
চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

প্রাপ্তিস্থান :
জ্ঞানদা পুঁথিঘর, ধর্মনগর

মূদ্রক :
মহামায়া আর্টস্ এণ্ড অফসেট
নেতাজীপাড়া, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

অক্ষর বিন্যাস :
সুজিত দাস (মো: ৮১৩১৯৭৩২৩৭)

প্রচ্ছদ :
অনুপম ভট্টাচার্য্য
Haploids advertising
Baroda, Gujrat

মূল্য :
২০ টাকা মাত্র
NOT FOR SALE

সম্পাদকের কলমে -

আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব (স্ব-ঘোষিত)। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছি এই তিলোত্তমা সভ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে। আমাদের বোধশক্তি এবং জ্ঞানের পরিধি এতোই বিস্তৃত, যার ফলে আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি সমস্ত জীবজগৎ।

এত কিছুর পরও কিন্তু আমার মনে হয় কখনো কখনো আমরা এমন কিছু কাজ করে থাকি যা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমরা শ্রেষ্ঠ জীব কিন্তু অনেক সময় আমাদের মধ্যেই কাউকে আমরা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়ে নিজেকে তাঁর পথে অনুধাবিত করি। এটা অবশ্যই ঠিক যে পৃথিবীর মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব ছিলেন বা আছেন যাঁদের আদর্শ দেশ ও দশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা কাউকে অন্ধ অনুসরণ করবো। যেহেতু আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সময় বিশেষে কাউকে অনুধাবন করতে পারি।

কিছুদিন যাবৎ আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করলে দেখা যায় আমরা সত্যিই বর্বরতার পরিচয় দিয়ে দিয়েছি। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কিছু ব্যক্তিত্বের আদর্শে (বক্তব্যে) আমরা এতোই অনুপ্রাণিত হয়ে গেছি যা আমাদের নিজস্ব ভাবনা বা জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছে।

আমরা স্ব-ভূমির স্বপ্নে মেতে আমাদের সভ্যতা বিনাশে ব্রতী হয়েছি। আমরা খন্ড হবার নেশায় মগ্ন। আমরা ধর্মের নামে সভ্যতা ধ্বংস করছি, ধর্মগুরুর নামে শহর ধ্বংস করছি, জাতির নামে দেশ ভাগ করছি, রাষ্ট্রের লোভে পিশাচ হয়ে গেছি। এটাই কি আমাদের সভ্যতা ! এই কি আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় !

গুরুদেব বলেছিলেন –

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত সেথা গৃহের প্রাচীর।"

আশা করি সুষ্ঠ জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করে আমরা এই সকল মরণযজ্ঞ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো।

বিনীত- প্রকাশক

Growing Seed

September, 2017

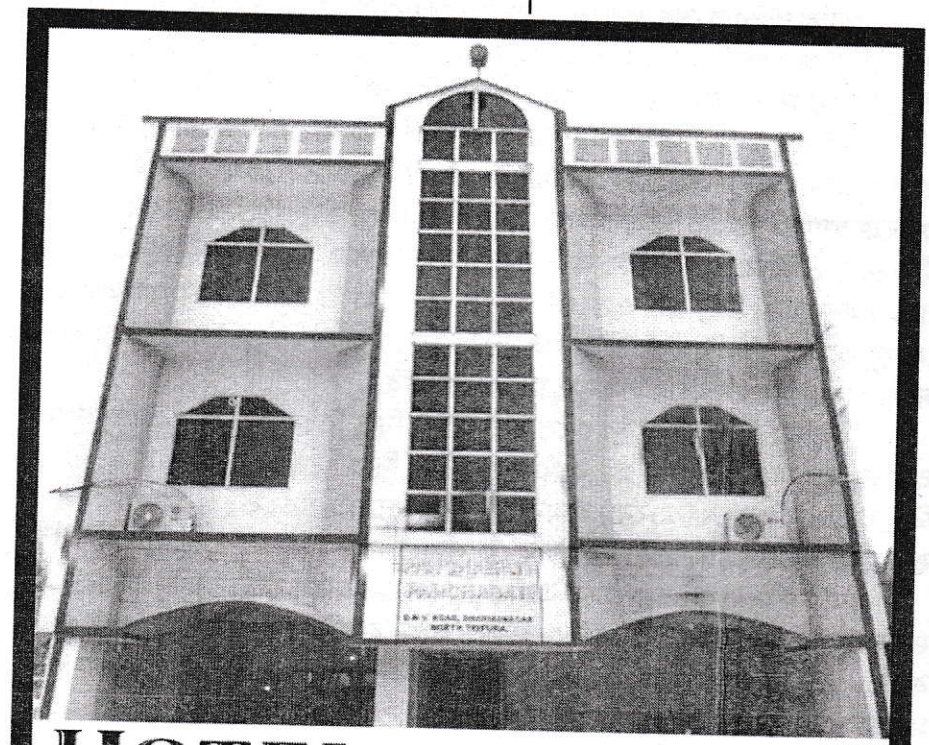

HOTEL PANCHABATI

Ph. (03822)235121
08730819772

D.N.V Road, Dharmanagar
North Tripura

Hotel, Reastaurent, Conferance Hall

AC- Room, Car Parking facility also available

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

বিষয়	ক্রমাঙ্ক	লেখকের
রক্ত রেখা	০১	বিধান চন্দ্র দে
খুড়ার কল	০৬	দধিচী
শিক্ষার হাল	০৮	সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য
বীজমন্ত্র	০৯	পায়েল দেব
কৌশল	০৯	শিউলি শর্মা
বিচিত্র ভ্রমণ কথা	১০	বিজন দেব
অবাক বিস্ময়	১৪	বরুণা ভট্টাচার্য্য
নারী ও ধরণী	১৫	প্রদীপ্তা চক্রবর্তী
শিবের ঘর	২০	সঞ্জয় চক্রবর্তী
অন্য কবিতা	২১	স্বপন ধর
খোলা চিঠি	২২	পুষ্পা দাস
সেন্টিমেন্ট	২২	অর্ণব ভট্টাচার্য্য
পূর্ব পুরুষের সন্ধানে	২৩	দীপঙ্কর গুপ্ত
রক্ত সঞ্চালন ও তার ব্যবহারিক দিক	২৫	ড. শান্তনু ঘোষ
বিজ্ঞানের টুকিটাকি	২৭	রূপম দেবনাথ
শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-সমাজ	৩০	দীপালোক ভট্টাচার্য্য
বৃদ্ধাশ্রম	৩১	পীযূষ কান্তি চৌধুরী
২১শে নভেম্বর	৩২	দেবজ্যোতি আচার্য্য
পারাসালসাস	৩৩	রত্নময় দে
হরগৌরীর সংসার	৩৯	রণজিৎ পুরকায়স্থ

Growing Seed আয়োজিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর কিছু মুহূর্ত

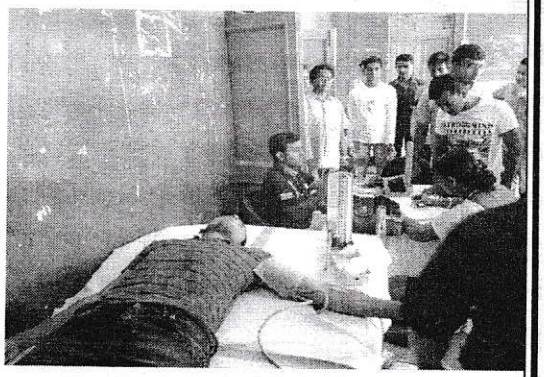

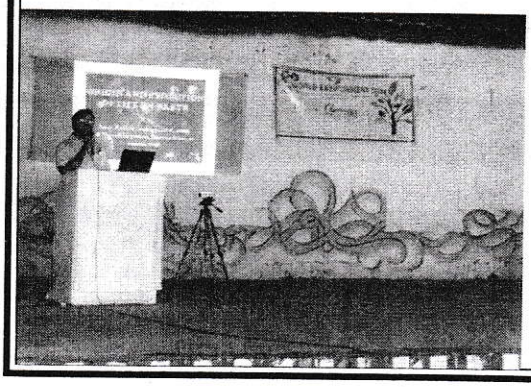

রক্ত রেখা

▣ বিধান চন্দ্র দে

বড়মুড়া পাহাড়ের বুকে ছোট্ট একটা গ্রাম - খামতিং বাড়ী - ছোট্ট তুই সিন্দ্রাই ছড়া গ্রামটাকে দু'ফালি করে দিয়েছে চাল কুমড়োর মতো। গ্রামের সব ছেলে-বুড়ো-যুবতী তাদের তৈরী শিল্পকর্ম-ফলন নিয়ে সওদা-ব্যাপার করে তেল্লামুড়া বাজারে। এখানে কত কী উপাচার - পসরা সাজিয়ে বসে ভূমিপুত্র কন্যারা। বন আলু, আনারস, তরমুজ, শশা, জুমের চাল কুমড়ো, ভুট্টা, কমলা, রামকলার থোর, বাঁশের কড়ুল, বন মুরগী, হাঁস, খরগোস, বনরুইয়ের মাংস সেগুন পাতায় মুড়ে বিক্রি হয়। আরো কত কী ! বাঁশ বেতের, কাঠের কারুকার্য্যময় দ্রব্যাদি - ওরা হাটে বিক্রি করে সংসার চালায়।

মোহন তিপ্রা এই গ্রামেরই ছেলে। তার নয় ছিদ্রের টিপারা ফ্লুট - আর নয় ছিদ্রের আড়া বাঁশির সুরে তুই সিন্দ্রাই ছড়ার জল নেচে নেচে যায়। মোহনের বাঁশির টানে বনের হরিণীরাও পথ ভুলে কান পেতে থাকে।

২৫শে বৈশাখের প্রাহ্ন বেলায়। সপ্তাশ্ব রথে চড়ে সূর্য্যদেব যখন রক্তিম ছটায় তুই সিন্দ্রাই ছড়ার জলে স্ফটিক দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল মোহন। বাঁশির সুরের সে গান বনভূমিতে অনুরণিত হল -

'হরু কাচাকাং তক বল লব কাচাং
লব ফাই লিয়াদ তকবুই
মাইরিক কুং কাচাং নুলব ফাইমানি
তাবুক কুং কাচাং ফাইলিয়াদ তকবুই
মাইরিক কুং কাচাং আচুক আং তংঅ
নিনি লব কাচাং নি বা গই।
ও তকবুই লব ফাইলিয়াদ - তাবুক
রম নানি বাগয় আং খুইতে নয় রি অয়-
কিরিদে নুংলব ফাইলিয়া
খুই পুং ফুইচা অইখিবিঅয় রিখা
ফাই অয়লব ফাইদি তাবুক

[অনুবাদ :- স্নিগ্ধ শীতল সন্ধ্যায় ও সকালে শীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ উপত্যকায় যে পাখি সুমিষ্ট স্বরে গান করত সে আর গান করেনা এসে। তার সুমিষ্ট স্বরে গাওয়া গানটি শুনার আশায় সকালে ও সন্ধ্যায় আমি বসে থাকি তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে। কিন্তু সে আর এলো না..... ।]

এমন সময় ছড়ার পাশ দিয়ে মাথায় জাপা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ভূমিকন্যা। ফুলমনি হালাম নাম তার। সে গানের সুর বাঁশির টানে বিমোহিত হয়ে এগুতে থাকলো। হরিণীরা যে ভাবে আকর্ষিত হয়। ধীরে ধীরে সে এক সময়ে পৌঁছে গেল বংশী বাদকের কাছাকাছি। পাতার উপর দিয়ে পদচারনার খস খস শব্দে বাঁশি থেমে গেল। কারো উপস্থিতি অনুভব করে নিমিলেশ নয়নে তাকায় মোহন।

কে ? জিজ্ঞেস করে মোহন।

থতমত খেয়ে চলে যাচ্ছিল লজ্জিত ফুলমনি। মোহন ব্যাকুল ভাবে বলে, যখন চলেই এসেছো কাছাকাছি তখন একদন্ড জিরিয়ে যাও না কেন ?

কিন্তু, কেন ? তোমার সুর ভঙ্গ করে আমি এমনিতেই অপরাধী, আমাকে যেতে দাও।

না-না মোহন তৎপরতার সঙ্গে বলে ওঠে - সুরভঙ্গের অপরাধ বোধ যদি মনে করো তাহলে তুমি নিজেই এক নতুন সুর শুনিয়ে আমাকে অনুশীলনের সুযোগ দাও।

ক্ষমা কোরো, তোমার সুন্দর সঙ্গীতময় জীবন, আমার অন্তরাত্মায় এক অদ্ভুত পবিত্রতার দ্যুতি ভরে দিয়েছে। সেখানে আমার .....

থাক ! এসব না বলে তোমার কাছে যা প্রত্যাশা করছি তাই করো। তখন এক দমকা হাওয়া এসে এতো জোরে বইতে লাগল যে সেগুন গাছের ডালপালা নেচে উঠলো। দু'কয়েকটি পাখি কিচির মিচির রবে কোরাস ধরলো।

অবনত মস্তকে ফুলমনি একবার আড়চোখে মোহনকে দেখে নিয়ে জাপাটি রেখে বসে পড়লো।

আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে-শৈলীতে তোমার গানের আদল এসে গেলে ক্ষমা কোরো। ফুলমনি গুনগুনিয়ে গান ধরলো -

'হারিনি ওয়াকরগ কুকুকছা ফুরু
হারী বেংছগি মায়্যা
তুই ছা তুই কুছু তর খালাই ফুরু
বারাই - টিকি রুকু মানিয়া
কুচুক তিখিং সিংতক খেপ চা ফুরু
তকমা ফেরে রুগ মানিয়া।
মাছা ছা গানাং ওয়াগ তালাং ফুরু
মারাই ছা টিকি রুকইয়া'

[অনুবাদ :- শুকরের পাল যদি বিক্ষিপ্ত ভাবে দৌড়ে পালায় তখন হাতীরও সাধ্য নেই তাদের একস্থানে জড় করে। ছোট নদীতে ও যখন ঢল নামে, তখন কোন কিছু দিয়েই

ওকে বাঁধ দেওয়া যায় না..... ।]

ফুলমনির গানের ইঙ্গিত মোহনের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এভাবে দিন যায় রাত গড়ায়। মোহন-ফুলমনির প্রেম কথা ছড়িয়ে পড়ে তুইসিন্দ্রার অলিতে গলিতে।

(২)

ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ে নৈসর্গিকতা নেমে আসে। আকাশে ঝলমলে আলো। সবুজ পাহাড়ে উপচে পড়েছে স্বর্ণাভ চাঁদ। মায়াকাজল চোখে হরিণীরা দল বেঁধে নেমে আসে জুমের ফসল খেতে। টঙ ঘরের আশে পাশে জুমের কচি কুঁড়ি ফসল হরিণের খুব প্রিয় খাবার। এ সময়ের জুম পাহাড়া দিতে হয়। না হলে শষ্যাদি নষ্ট করে হরিণীর দল। মোহন তাই টঙ ঘরের দাওয়ায় বসে জুম পাহাড়া দেয়। কারণ জুম নষ্ট হলে জীবিকার বিকল্প পথ বড় কষ্টকর। শহরে গিয়ে গতর খেটে জীবিকা নির্বাহ করা মোহনের পছন্দ নয়। মোহন তাই রাতভোর বাঁশি বাজায় আর জুম পাহাড়া দেয়।

প্রায় দিন সন্ধ্যায় ফুলমনি আসে। অনেক রকম খাদ্য দ্রব্য আনে। পিঠে পায়েস সুস্বাদু খাবার। দু'জনে মিলে মিশে খায়। মোহন বাঁশি বাজিয়ে শুনায় আর জুম পাহাড়া দেয়।

আর ফুলমনির চোখে জল ঝরে.....

'মই মানলিয়া মায় বাবুনি জ্বালা
ফাইদি চুং নক ছাড়ে থাংলা-
তরিয়া লক য়্যাছা মায় বাবুল মায়া
তরখায় প্রান যাদুন মায়া
ফাইদি দুংদেকা ছাড়ে ওই থাংলা-
হা পাই মিনিয়া - বলং কিরিয়া
যাদুনুং লগে তংথাই
থাগদা করুই সুমুগ তকমাস-
থাইন লগে তংথা
কইনি চনাচিন - কিরিনানি
থমনিনতা - বচুংমনি চাম কুরুই
থমন চু কিরিনানি
বাআ - বাদশা ববি ওই চা রোয়া
রাজন চুং কিইরু অ-য়া
যাদু ফাইদি য়্যা ছক ছাকান থাংনী-

(৩)

[অনুবাদ :- মাতা পিতার কটুকথা আর সহ্য হয় না। চল আমরা সব ছেড়ে চলে যাই..... সুন্দর স্বপ্নের মতো একটি নীড়ে থাকবো দু'জনায়।]

(৩)

কয়েকদিন ধরেই পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে গুলির আওয়াজে সবাই সন্ত্রস্ত। উগ্রবাদীরা এদিকে এসে সেলটার নিয়েছে। আসাম রাইফেলস আর ত্রিপুরা রাইফেলসের জোয়ানেরা ধাওয়া করেছে ওদের। পাহাড়ের খানা খন্দে ঝোপ ঝাড়ে অনবরত অপারেশন আর এনকাউন্টার চলছে। গুলি পাল্টা গুলির শব্দে আকাশ বাতাস ভারী।

সূর্য্যের শেষ রঙ্গিন সোনালি বিষন্নতা ছড়াচ্ছিল পাহাড়ের উঁচু উঁচু গাছগুলির কচি কচি পাতায় মগডালে। দিগন্তের কাছে জড়ো হয়েছিল জামরঙা একটি গভীর ছায়া।

তিনদিন হলো ফুলমনিও আসেনি। মোহন নিজেই অবস্থা বুঝে বারণ করেছে ওকে। সন্ধ্যার ফিকে আলো ছায়ায় কার যেন উপস্থিতি টের পেল মোহন। খানিক পরেই বুঝতে পারল ফুলমনি ডাকছে ওকে। টঙ ঘরের নিচে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, বেলে মাটির শিল্প প্রতিমার মতন।

মোহন টং ঘর থেকে নেমে আসতেই ওর বুকে আছড়ে পরে ফুলমনি। অশ্রুসিক্ত ফুলমনিকে জাপটে ধরে মোহন বলে উঠে - ইশ, কেমন লতার মতো হেলে পড়লে যে। নিজেকে শক্ত করো, ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন ?

ফুলমনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। ওর লবণাক্ত চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়লো মোহনের মসৃণ বুকে। শক্ত করে ফুলমনিকে জড়িয়ে ধরে মোহন গেয়ে উঠল-

'ছাবছা অচিনি কান কুরুই
বাচাদি যত ছিক্লা চ্লী বরক বুরুই
জুদাহা - ফাইচিং - নাইদি।
ইয়াগ বাই ইয়াগ রজয় তংনানি
হংআনু
যুমানি খাল বাই খ্লাই।

[অনুবাদ :- কে বলে আমাদের শক্তি নাই। স্ত্রী-পুরুষ যুবক যুবতী তোমরা সবাই জেগে উঠ। নতুন দিন আসছে। এক হতে হবে। আর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলে হাতে হাত ধরে থাকবো সবে।]

(৪)

ভাগ্যের কি পরিহাস। খামতিং বাড়ী, উপজাতি পাড়ায় শুরু হয়ে গেল বৈরী-পুলিশে খন্ড যুদ্ধ। জুমের ক্ষেত তছনছ হল সামরিক দাপাদাপিতে। বিঝুদিনের ধর্মের ঢেউ উবে গেল। মোহন-ফুলমনির জীবন অনিশ্চিত পথ ধরে চললো। পাড়ায় এখন

ঈশ্বরের আরাধনা আর ধর্মীয় কীর্ত্তন অহোরাত্র চলছে। যাদের মেয়েদের বিয়ে হয়নি সোমত্ত যুবতী, যাদের ছেলেরা বিভ্রান্ত হয়ে বন্দুক নিয়ে হয়ে গেছে বৈরী, যারা ধার-কর্জ্জ করে জুম চাষ করেছিল - সবাই এই সঙ্কটে নতজানু হলো - দেবদেবীর পদে।

রাত হয়ে গেছে, আমাকে যেতে দাও। বুকে বিলি কেটে বলে ফুলমনি।

কী এমন রাত হয়েছে, তবু হ্যাঁ, যাও, চলে যাও, মোহন উঠে দাঁড়ায়।

মোহন বাঁশিতে একটা করুন সুর ভাজতে ভাজতে নেমে পড়ল টঙ ঘর থেকে। ওর পিছু পিছু নেমে এলো ফুলমনি। এমন সময় দুপদাপ আওয়াজ ও গুলির শব্দে কেঁপে উঠল বন প্রান্তর। আঁতকে দু'জন জড়িয়ে ধরল দু'জনকে। টঙ ঘরের সামনে প্রজ্জ্বলিত লাল মশালের আলোয় ততধিক লাল দেখাচ্ছে মোহন-ফুলমনিকে। চতুর্দিক থেকে ষ্টেনগান আর এস-এল-আরের গুলিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে উঠল মরণ আর্তনাদে। মোহনকে প্রচন্ড জোরে খামচে ধরল ফুলমনি। দমবন্ধ করা কয়েকটা মুহুর্ত্ত। তারপর ফুলমনির নীথর দেহটা আঁছড়ে পড়ল বনভূমিতে। চারিদিকের তীব্র টর্চের আলোয় মোহন দেখতে পেল লাল রক্তে ভিজে গেছে তার প্রেম প্রতিমা। ফুলমনির নিস্প্রাণ দেহটা টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দিয়ে দেশরক্ষায় অতন্ত্রী প্রহরীরা রক্তস্নাত মোহনের হাতে পড়িয়ে দিল হাতকড়া। অব্যক্ত আর্তনাদে মোহন চীৎকার করে। বনভূমিতে আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়।

(একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

চিঠি মহল
রাণা প্লাজা, বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর,
উত্তর ত্রিপুরা,
মোবাইল: ৯৪৩৬১৩২৭৩৩

শুভ বিবাহের কার্ড, অন্নপ্রাশণ, উপনয়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রন কার্ডের এক বিপুল সম্ভার। এছাড়াও শ্রাদ্ধের কার্ড, সকল প্রকার গ্রিটিংস কার্ড ও মুসলিম বিয়ের কার্ডের মেলা।

ফ্রেন্ডস কেটারার
বিবেকান্দ রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
মোবাইল: ৯৪৩৬১৩২৭৩৩/৯৪৩৬৪৭৯২৩০/
৯৮৬২৬০৯৫৪৯

যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে আপনার পছন্দের আমিষ/নিরামিষ রান্না করা খাবার সরবরাহ ও পরিবেশনের সুলভ সুযোগদানে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ।

খুড়ার কল

▣ দধিচী

খুড়ার কল ইখান আজকের নায়, বউত আগে বাজারে আইছে। বেশির ভাগ মানুষেউ ইকান ক্যামনে কাম করে ইটা বোঝে না। বেশির ভাগ মানুষে ইটাও জানে না যে খুড়ার কল ছোট বড় বউত কিসিমর অয়। কিছু দেখতে শুনতে অতো ভালা যে আফনে টের অউ পাইতানায় যে আফনারে বাঁশ দের। একখান উদাহরণ দেই। জায়গা হইল গিয়া উত্তরাখন্ড, সাল ২০১৩। এক ব্যাটার দোকানো জাইতাম আমরা সিঙ্গারা খাওয়াত। ব্যাটা আছিল সন্ত (!) রাম রহিমর বেতালা ভক্ত। তো ব্যাটারে একদিন কইলাম আফনার গুরুদেবরে তো একটু অইন্নো ভাইলোর লাগে ; ব্যাটা অমনেউ ক্ষেপিয়া লাল। কয় - "তোমরা জানো নি গুরুজীয়ে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খিষ্টান হকলরে একখানো মিলানির লাগি কি পরিশ্রম কররা ; আর তোমরা High Caste ব্রাহ্মণ হকলে দেশের সর্বনাশ কররায় (ব্যাটায় কিন্তু আসলে জানে না আমরার জাত কিতা ; কিন্তু ধরিয়া নিছে যেহেতু আমরা রামরহিমর সমালোচনা করছি অতএব আমরা ব্রাহ্মণ)। কিছু দিন আগে বাইরলৈ ঐ তান্ গুরুদেবে গুহা খুদিয়া কুকর্ম কররা। তে অউ যে তাইন যুক্তি দিয়া কথা না ভাবিয়া আগেউ আমরারে গাইলাইলা ; অউ অটাউ অইল একরকম খুড়ার কল। রামরহিমে অরকম খুড়ার কলরে কামো লাগাইয়া বেজান কানা মানুষর দল বানাইছইন।

আরেকখান দেখইন, যেদিন অমর্ত্য সেন Demonitisation অর সমালোচনা করলা ; অদিন বেজান মানুষে তানে বেদুমসে গাইল্লাইসে। ব্যাটার বুলে বুড়াকালো ভীমরতি ধরছে। অমলাকান একজনে যখন আমার সামনে নিন্দা করের তখন জিখাইলাম "তুমি কিতাবা তান হকল বই পড়িলিছো না কিতা ?" তাইন কইলা - "না ; কিন্তু ব্যাটা তো চীন অর দালাল অতার লাগি অমলাখান মাতের।" আমি কইলাম "তে আফনে যদি ব্যাটার লেখা বইগুন পড়িয়া সমালোচনা করইন তে কোন সমইস্যা আছে নি ?" পরে বোঝলাম দোষ আমার ওউ, ব্যাটার গলাত্ তো খুড়ার কল বান্ধা। একদম হুবহু অউরকম আরেকখান ঘটনা হইছিল গান্ধীজীরে লইয়া। আইজ কাইল তো কেউ অউ গান্ধিজীরে দেখতো পারে না। যদি আফনারা খিয়াল করইন তে দেখবা এর মইধ্যে ৯৫% মানুষেউ গান্ধীজীর লেখা 'My Experiment with Truth' বইখান পড়ছইন না। নিজে না পড়িয়া আরেকজনের লগে গলা মিলাইয়া "অয় অয়" করাও কুড়ার কল। কাশ্মীর লইয়া তো একবার খুন খারাপি হওয়ার উপক্রম ; আমি কইসলাম আফনেরা যে কাশ্মীর লইয়া মাতরা তে আফনারা Our Moon has Blood Clot, Curfewed Night, The Collaborator Kashmir the Vajpayee years. অতা বই পড়ছইন নি ? অমনেউ আমারে প্রায় মারার উপক্রম। কইন "তোমরা হারামজাদা হকলে খালি পাকিস্তানী কাশ্মীরী মুসলমানের চ্যামচাগীরি

করো ! উবাও ! বেশীদিন নায় ; তোমরারেও পাকিস্তানে পাঠাইমু।" পাঠকরা যারা অউ বই অগুন পড়ছইন তারা জানইন যে, Our Moon has Blood Clot - ইটা কাশ্মীরী পন্ডিতরার উপরে লেখা। কিন্তু পাবলিক অকলে তো নেতারা কইলা অতাউ শুনিয়া আমরারে পাকিস্তানে পাঠানির ধমকি দিলা ! (খুড়ার কল অর বলি আর কি !)

আরো কিছু মানুষ আছইন্ ; বেতালা বেতালা নামী ইউনিভার্সিটি থাকি, কলেজ থাকি বিভিন্ন বিষয় নিয়া, দেশের সমস্যা (!) নিয়া আলোচনা করইন। এর মইধ্যে কেউ কেউ আবার পি.এইচ.ডি-র মতো বড়ো বড়ো ডিগ্রীধারী। মানুষেও অয় ! অয় ! করইন তারার লগে। যেতা বিষয় নিয়া মাতোইন ইতার লগে তারার গবেষনার বিষয়র দূর-দূরান্তে কোন সম্পর্ক নাই। Google Scholer, Research Gate, CERA, অতা হকলতা তুকাইয়াও তারার কোনো গবেষনা পত্র পাওয়া গেল না। কিন্তু মানুষে আর খবরোর চ্যানেলে তারারে লইয়া ধূম নাচানাচি করলা। অটাও একটা খুড়ার কল।

ছাত্ররারে খুড়ার কল ব্যবহার করিয়া অউ ইস্কুলো থাকতে থাকতে অউ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নিজেরার আদর্শ (!) ইনজেক্শন দিয়া তারার খুপড়িত ঢুকানি শুরু করে। তেরাভাবে তারারে বোঝানি হয় পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা করলেও তোমরা দুইবেলা ভাত পাইতায় নায় ; অতা না করিয়া মিছিল মিটিং করলেউ তোমরার লাভ। অটা হইল খুড়ার কল সব রাজনৈতিক দলেউ ইটা করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকর সময়ও বোর্ড ইতায় অনেক পুলাপানরে কলাপাতাত লেখিয়া দেয় - "তোমরার দ্বারা কিছু অইতো নায় রেবা"- ইখানো একখান কল। সব মানুষের মইধ্যেউ সামর্থ্য থাকে।

আফনারা সকাল বিকাল যে নিউজ চ্যানেল দেখইন, পত্রিকা পড়ইন্ ইতাত্ অতো খুড়োর কল ব্যবহার কইর‍্যা আফনারারে টুপি পরানি হয়।

অখন কথা হইল কেমনে বাঁচবা এই কল থাকি -

১। বই পড়ইন। কি দরকার নেতা, মন্ত্রী, দুই নাম্বারী সাধু সন্ত থাকি রাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস শিখার ? তারার কথা বেদবাক্য না মনে করিয়া নিজে পড়িয়া দেখইন না আসল ঘটনা কিতা।

২। নিজর পুলাপানরে ছোটবেলা থাকি পাঠ্য বইয়র লগে গল্পর বইও আনিয়া দেইন। বুড়া কালো আফনারে ভাত দেওয়ার চ্যান্স বাড়ব এতে !

৩। বুদ্ধি, বিবেক বিবেচনা অতা ব্যবহার করইন। টিভি বন্ধ করি আফনার প্রতিবেশীর লগে সামনা সামনি বইয়া দুই কথা মাতোইন।

৪। সামর্থ্যর মইধ্যে ভ্রমণ করইন। লোকাল মানুষর লগে মিশইন।

৫। Growing Seed অর লাকান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খুলতা পারইন বা যোগদান করতা পারইন। আমরা চাই মানুষ ভালা থাকুক।

শিক্ষার হাল

▣ সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

ছোটোবেলায় ইচ্ছে ছিল খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে,
বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই ইচ্ছেই কিছুটা
উল্টেপাল্টে পিছুগামী হয়ে গেছে,
জটিল এই সংসারে
নির্ভেজালী কল্পনার দুনিয়ায় যেতে আবার এ মন চাইছে।

জানি না কবে থেকে ইচ্ছেরা বাস্তবের কাছে মাথা নত
করতে শিখেছে,
বাস্তবের আয়নায় কিভাবে নিজেদের স্বল্পপরিসরে
মানিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে।
কাগজের জেরে তো শিক্ষিত হলাম সবাই ঠিকই-
কিন্তু মনুষ্যত্বের পাঠ সঠিকভাবে কজন নিতে
পেরেছি?

মাঝে মাঝে মনে হয়,
অফিসবাবুদের থেকে দিনমজুররা অনেক বেশি
ভালো-
মেকি-আড়ম্বরতায় তারা তাদের জীবন সাজায়
নাকো।

কিন্তু শিক্ষা সে তো উদার হতে শিখায়,
বৃহত্তের মাঝে আপনকে মুক্তির পথে মেশায়;
শিক্ষিত সমাজ সে তো আজ স্বার্থপরের সাজে-
তাইতো শিক্ষা পোশাকি চাকচিক্যেই শুধু লুকায়
লাজে।

বড় অবাক লাগে যখন দেখি শিক্ষিত সমাজে

সম্পর্কের কোনো মূল্য নাই,
মা-বাবাও পর হয়ে যায়-
এবং তাদের দুঃখ হয়ে যায় শুধু একমুঠো
শ্মশানের ছাই।

আজ আর থাক্,
শুধিয়ে যাই কেবল শিক্ষার এই নির্মম হাল-
গোটা জীবনটাই যখন এক আদর্শ শিক্ষালয়,
শেষে প্রাইভেট-নামী স্কুল-কলেজেই নাহয় হলো
মেকি-শিক্ষার ঢাল।।

কৌশল

▣ শিউলি শর্মা

পুচ্ছধারী কাকের সাথেই
আমার বসবাস।
টেকনোলজির সূক্ষ্ম দক্ষতায়
সাজানো পাখনায়
গলে মরছে পতঙ্গের সুখ,
মানবস্পর্শে ভেসে আসে খাঁ খাঁ।

বীজমন্ত্র

▣ পায়েল দেব

এভাবেই একটু একটু করে
ফুরফুরে বিকেলগুলি বিক্রি করি
সোনালি সূর্যাস্তের কাছে।
বুকের বোতামগুলি
রাত্রির কাছে বন্ধক রেখে,
অনায়াসে ফেরি করে ফিরি,
ঘুমের ওষুধ।
কয়েকটি নিশ্চিন্ত ঘুমের আশায়,
রাত বুকে নিয়ে আরাধনা করি
মধ্যবিত্ত স্বপ্নের বেঁচে থাকার।
শয়নকক্ষ থেকে পালিয়ে যেতে দিই,
বহুদূর,
আসন্ন বিপ্লবের মিছিলে...

একদিন হঠাৎ দেখি
স্বপ্নগুলো নদী হয়ে গেছে...

বিচিত্র ভ্রমণ কথা

▣ বিজন দেব

॥ ১ ॥

বেড়ানোর কথা উঠলেই আমরা সবাই যেন একটু অন্যরকম মানুষ হয়ে যাই। রোজকারের সেই একই রুটিন, দায়িত্ব, পরিচিত চেহারা, রাস্তাঘাট আর প্রিয় অপ্রিয় ঘটনাবলীর মাঝে একটু বেড়ানোর গল্প, কোথাও কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসার ইচ্ছা- আমাদেরকে পাগল করে তুলে। সেই একই ঘরকুনো মানুষ ভ্রমণের ডাকে পিঠে ঝোলা বেঁধে যেন কোন বিশ্বপর্যটক ! কোন রমতা যোগী ভ্রমণের নেশায় চোখে রোদ চশমা দিয়ে জিনস্ পরিহিত কোন অস্থির যুবক। ভ্রমণের নেশা বড়ই বিষম নেশা। ঘরের নিরিবিলি একান্ত আশ্রয় থেকে গৃহবাসীকে টেনে হিচঁড়ে রাজপথে নামিয়ে তার শান্তি। প্রভিডেন্ড ফান্ডের জমানো টাকার দফারফা করা কিংবা সারা মাস আলু ভাত খেয়ে সঞ্চিত অর্থের গঙ্গাপ্রাপ্তির মূল হোতা হল এই - 'একটু বেড়িয়ে আসা'।

তবু আমরা ভ্রমণবিনাশী নই, ভ্রমণ বিলাসী হতে চাই। আমাদের রক্ত মাংসে, অস্থিতে, মজ্জায় বেড়ানোর পাগল করা নেশা। আমরা ঘরে-বাইরে কাঙাল, হিসাবে অকপট লাচার, কিন্তু বেড়াতে গেলে সেই একই মানুষ যেন এক একজন খরচিয়ে মহারাজ।

॥ ২ ॥

ভ্রমণের মহিমার কথা বলে শেষ হয় না। দশদিনের বেড়ানোর গল্প আমরা দশ বছর ধরে করি। সুযোগ পেলেই হল - কথক আর শ্রোতার তালমিল দেখার মত। একজন শেষ করার আগেই অন্যজনের শুরু, আর অন্যজন দীঘা নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগেই আরেকজন পুরী সিরিজ নিয়ে আসর মাতাতে হাজির। হাউসফুল। সবাই যেন আমরা শঙ্কু মহারাজের চেলা। হিমালয় ভ্রমণ নাইবা হল - কিন্তু টাইগার হিলে কনকনে ঠান্ডায় মেঘলা আকাশে সূর্যোদয় আর শত কি:মি: দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা না মিললেও আমাদের কোন হতাশা নেই। এই অদেখা আর কিঞ্চিৎ দর্শনই আমাদের গল্পের ঝুলি ভরে রাখে। এতেই অনেকদিনের রসদ জমে যায়। সময় বুঝে সুযোগ দেখে ব্যবহারের মহিমায় আমরাই তো ভূ-পর্যটক, পবর্ত আরোহী। নভঃচর, সমুদ্রযাত্রী কিংবা অরণ্যচারী। আমরাই সব। বাড়ির পাশে আরশিনগরে আমাদের মন নেই। মন পড়ে থাকে কোন সুদূর পিয়াসীর তরে।

॥ ৩ ॥

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণবিষয়ক লেখালেখির একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিষয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আর এই গরিমার ঐতিহ্যকে অনেকটাই বেকায়দায় ফেলে এক সাধারণ ভ্রমণযাত্রী হিসাবে আমার বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে দু-একটা ঘটনার কথা লিখব ভেবেছি। একটু অন্যরকম ঘটনার কথা, যা সাধারণত ভ্রমণ কাহিনীতে স্থান পায় না। তবু লিখে রাখার তাগিদ জাগে। কেননা সব কিছু নিয়েই আমাদের সাধের, আহ্লাদের 'ট্যুর এন্ড ট্র্যাভেলস্ - ভ্রমণকথা'।

॥ ৪ ॥

সাল ২০১০। যাব হিমাচলপ্রদেশের ধর্মশালায়। সেখান থেকে ম্যাকলডগঞ্জ। ধর্মশালা থেকে অনেকটা উপরে - আরেকটা শৈল শহর। দলাইলামা সদলবলে এখানেই থাকেন। তিব্বতী কলোনী। বিখ্যাত তিব্বতী মোমো এখানেই পাওয়া যায়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সুন্দর সাজানো গুছানো শহর। প্রচুর দেশী-বিদেশী পর্যটকের ভিড়ে প্রাণচঞ্চল।

পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহরে আমার জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসের বিরতি। এখান থেকেই ধর্মশালার বাস ধরতে হয়। যথারীতি তাই করলাম। প্রায় চার ঘন্টার রাস্তা। ধর্মশালা পৌঁছে ছোট গাড়িতে ম্যাকলডগঞ্জ। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা। একা মানুষ। আগে থেকে হোটেল বুক করে রাখার প্রয়োজন বোধ করি নি। কিছু একটা খোঁজে নিলেই হবে। জগিওয়ারা রোড। প্রায় সব হোটেল এখানেই। হোটেলের জমক দেখে আমার সাথে মানানসই কোন সস্তার হোটেল খুঁজতে হাঁটা দিলাম। ডানে-বায়ে হোটেলের বাজার। দেখে দেখে ঢুকে পড়লাম। হোটেল 'প্রিয়দর্শিনী'।

"সিঙ্গল রুম হ্যাঁ ?"

"হ্যাঁ। আপ কাহাসে হ্যাঁ ?"

"নর্থ-ইষ্ট।"

'কোনসা স্টেট ?"

"ত্রিপুরা।"

"ক্যায় আপ বাঙালী হো ?"

"হ্যাঁ জী।"

এইবার বছর তিরিশের হিমাচলী হোটেলকর্মীর মুখ থেকে সমস্ত আলো এক লহমায় নিভে গেল। মনে মনে প্রমোদ গুনলাম। এমনিতে ভারতের বেশকিছু ভ্রমণস্থলে গিয়ে বোঝতে পেরেছি ত্রিপুরা বলে কোন রাজ্য আছে বলে অনেক পন্ডিত ব্যক্তিরাই জানেন না। আর সাধারণ মানুষের কথা তো ছেড়েই দিন।

কিন্তু এই 'প্রিয়দর্শিনী' হোটেলের সমস্যাটা ঠিক কাকে নিয়ে বোঝতে পারলাম না। 'নর্থ-ইষ্ট', 'ত্রিপুরা' না 'বাঙালী'....

"হামলোগ বাঙালী আদমিলোগকো রুম নেহি দেতে। সরি"

দুইগালে কে যেন সজোরে থাপ্পড় কষালো। অহিংসার শহরে এসে হঠাৎ রক্তাক্ত হলাম। মনে হল ম্যাকলডগঞ্জে নিজের জন্য হোটেল রুম খোঁজার এখানেই ইতি। এইবার যথার্থই 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

কিন্তু হে বালক ! কেন ? কেন এই শপথ ? কিউ, কিউ, কিউ.....

"এই শহরে প্রচুর বিদেশী পর্যটক আসেন। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগুরু দলাইলামার টানে। অন্যান্য ভ্রমণস্থল থেকে এই স্থানটা একটু আলাদা। বৌদ্ধ ধর্মের মূল বিষয় নীরবতার অনুশীলন এখানে সর্বত্র। তাই বিদেশীরা এসে প্রথমেই বুঝে নিতে চায় হোটেলের নির্জনতা, তার নীরবতাকে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত ভাড়া দিতেও তারা প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা তৈরী কের বাঙালী পর্যটকেরা। মানা করা সত্ত্বেও মদ খেয়ে নেচে গেয়ে হোটেল মাথায় তুলে তারা। চুপচাপ থাকার ব্যাপারে বাঙালীরা বেজায় কুখ্যাত। তাই বিদেশীরা হোটেলে রুম বুক করতে এলেই আগে জানতে চান - কোনও 'বংগালী' হোটেলে রুম নিয়ে আছে কি না।"

- ('প্রিয়দর্শিনী' হোটেলের রিসেপসনিস্টের বয়ানটা মোটামুটি অক্ষত রাখার চেষ্টা করেছি।)

॥ ৫ ॥

চমৎকার শহর মহারাষ্ট্রের ইগতপুরি। মুম্বাই থেকে প্রায় ২০০ কিমি আগের স্টেশন। মেইন লাইন। কালো পাহাড়ে চারদিক ঘেরা। এই ছোট্ট শহরে দশদিনের বিপাসনার শিবির শেষ করে মুম্বাইগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম। ২০০৯ সালের নভেম্বর মাস, রবিবার। হাতে একদিন সময় আছে। পরের দিন ভোরে ঔরঙ্গাবাদের ট্রেন। অজন্তা ইলোরা দেখার শখ। তাই ঠিক করলাম রবিবার কোন ট্যুরিস্ট বাসে মুম্বাই শহরটা ঘুরে দেখা যাক। সাথে অঙ্কুরজি, শিবিরে পরিচয় হওয়া মুম্বাইকার। আমার লোকেল গাইড।

সি এস টি স্টেশনে নেমে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম সাইট সিয়িং ট্যুরিস্ট বাসগুলি অনেক আগেই বেড়িয়ে গেছে। আগত্যা স্টেশনের বাইরে একটা বাসে উঠে বসলাম। রেট ১০০ টাকা। মুম্বাই শহরের কিছু দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখাবে। আমাকে জন অরণ্যে একা ছেড়ে অঙ্কুরজী ঘরে ফেরার বাস ধরল। টানা ১২ দিন পর ঘরবাপসি।

রবিবারের হাল্কা ভিড় ঠেলে বাস ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। বাসের কন্টাকটারই আমাদের গাইড। একে একে হোটেল তাজ, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, আরবসাগরে নোঙর ফেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বিজয় মাল্যের দুধসাধা বিলাসী বজরার মোহ ছেড়ে আমরা রওনা দিলাম জুহু বিচের দিকে।

এদিকে বাসে নিজের সিট ছেড়ে এসে বসলাম ড্রাইভারের সাথে একটু গল্প জমানোর উদ্দেশ্যে। আশোকজি বাসের চালকের নাম। বাড়ি নাসিক। বছর তিরিশের যুবক। পরিশ্রমী, সুঠাম শরীর, একমাথা কোঁকড়ানো চুল। সাত বছর ধরে মুম্বাই শহরে বাস চালক। রাতে বাসের মধ্যেই ঘুম। বাসই ঘর-বাড়ি সব। মুম্বাইয়ে থাকার জায়গার খুব দাম। বাড়িতে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাতে হয়। বৃদ্ধ মা, তিন বছরের মেয়ে আর বৌ নিয়ে সংসার। তারা সব নাসিকেই থাকে। সামান্য কিছু জমি আছে। তাতে আঙ্গুর চাষ হয়।

কথা বলতে বলতে জুহু বিচে এসে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। হাজারো দোকানের ভিড়ে সমুদ্রের খোঁজ পাওয়া মুশকিল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম বিচের দিকে। জুতা হাতে নিয়ে ভেজা বালিতে হাঁটাহাঁটি। বাচ্চাদের দৌড়ঝাঁপ, চিৎকার উৎসাহ দেখার মত। পুরো বিচ জুড়েই মেলা। বড় জমজমাট পরিবেশ। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। হাঁটতে হাঁটতে একটু বেশি এসে গেছি। এদিকটায় আলো কম। লোকজনও হালকা। আমাদের বাসের চালক আশোকজি একটা বড়পাথরের উপর বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে। কি ব্যাপার !

চুপচাপ ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখতে পেয়ে আশোকজি নিজে থেকেই জানালো বাড়িতে মেয়ের শরীর খুব খারাপ, পাঁচ-ছয়দিন ধরেই খুব জ্বর। আজ অবস্থা দেখে হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হয়েছে। এদিকে অনেক অনুরোধেও এই সপ্তাহে এক দিনও ছুটি পায়নি মালিকের কাছ থেকে। কাল একদল ট্যুরিস্ট নিয়ে লোনাভালা যাবার অগ্রিম বুকিং। কোনভাবেই ছুটি পাবে না। এদিকে বাড়িতে মেয়ের এই অবস্থা। না গেলেই নয়।

সারাদিন ধরে বাস চালিয়ে হাজারো ব্যস্ততার মাঝে একবারের জন্য নিরিবিলি বসে অসুস্থ মেয়ের কথা ভাবতে পারিনি। এখন জুহুবিচে সমুদ্রের সামনে একটু আড়াল পেতেই মনের সব দুঃখ, যন্ত্রণা, জলের তোড়ের মতো ভেসে উঠল। নিজেকে আর সামলাতে পারেনি আশোকজি।

চোখের সামনে রাতের অন্ধকারে বিস্তৃত আরবসাগরের জল। ডাইনে-বায়ে মুম্বাই নগরীর আলো ঝলমলে স্কাইলাইন।

একটু আনন্দ পেতে বেড়াতে আসা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে আমি আর আশোকজি চুপচাপ সাগরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল কোন শেষ না হওয়া মরুভূমিতে পথ হারিয়ে একটা মানুষ ধীরে ধীরে চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে।

সাথে আমিও।

অবাক বিস্ময়

▣ বরুণা ভট্টাচার্য্য

একদিন আমরার গেরামর পরের গেরাম অবায় দিয়া হাটিত্‌রাম। এগু ছোট পুয়ায় আমার লগ ধরছে। পুয়া ওগুয়ে কয় ঠাহুরদা বো হউ গালাবায় যাইও না। অন গেলে পরশ অইবায় তুমি। তেউ তার কথা হুনিয়াউ আউগাইলাম। আমি আবার তার হকল কথা বুঝি না। অত গেরামর কথা হকল সময় হুনি না তো। বুইঝতে থোড়া অসুবিধা হয়।

হাটিতরাম তো এক দিশায়, দেখি এগু পুড়িয়ে ফুরইন দিয়া উঠান ফুরের। কিতা কইতাম গো, তাই কয় অখান গমানি অই গেছে তুমি পাড়াইবায় চাইয়।

আমি কইলাম আওয়া যাওয়ার পথ আবার গমাইননি গো ওগো বইন কিতা কইলায়। অবায় যাইতাম নানি। অয় দাদু অয়। চল আইজ আমার ঘর যাইবায়। তোমার কথা হুনতে অত ভালা লাগের গো দাদু। বেজান মাতিতে মাতিতে তার ঘর যাইতরাম। একটু আউগাইতেউ দেখি পথ জুতা লইয়া হাটা যায় না। ও দাদু অন পেক, তে দেখি হে কয় তোমার জুতা আমি লই তেউ তুমি আইতায় পারবায়। তে বাড়ীত লই গেলগি। অ মাই বাড়ীত তো লই গেল বাড়ীত নিয়া পাও ধোঁয়ার জল, গামছা লইয়া আইছে তো না হে পাও ধোওয়াইয়া গামছা দিয়া পা মুছাইয়া দিলাইল। আবার একখান পেন্নামউ করিল। এরপরে দেখি বাড়ীর হক্কল বুড়া-বুড়ি, ছাওয়াল এক এক করি পাও ধরি পেন্নামও করিল, তে কততা খাওয়াইল আমারে, যেন দেফতা পূজা অনউ করিলার। বড়উ ভালা লাগিল অতা তো চউখে দেখা যায় না আইজ কাইল। ভগবান তোমরার মঙ্গল করইন যেন। আস্তে আস্তে বাড়ীবায় রওয়ানা দিলাম। পথ হুনি চিৎকার, কিতা রে.... হুনছচ নি বে ধনদি ..... অজাত কাউচালি করিতরা, কিগুইন বে অবাজুত। অবায় একবাজু লইলাৎরা - দেখি চাই। ওখানো একখান ইসকুল বে। অজাত পুয়াপুড়িনতর কাউচালি -

ও অন খাইতরা বে ইসকুলর পুয়াপুড়িন্তে। অতা তে কিতা অখনকুর কারবার। ইসকুল ভাত খাওয়া, কততা যে মইরবার আগে দেইখমু। হুনবে দেখি - অতায় ডিম ভাত খাইতরা বে। ইসকুল অতা কিতা ও মাই গো অত উরাউড়ি করিতরা কেনে অতায়। মাষ্টর হকল চাইয়া দেখিতরা। অতার হুশ নাই। তবুও অতায় কিতা যে করিতরা। অবায় ডাইন হাত দেইন তো আরেগুর পিছেদি বাউ হাত বাড়াই দিয়া আরেকটা ডিম লইলাইছইন। কিতা যে আরম্ভ করছইন পুয়াপুড়িন্তে। কেমনে সামাল দিতা মাষ্টর হকলে।

এরমাঝে এগু পুয়া আইছে হেড স্যারর কাছে, আইয়া কয় আমারে ডিম লইতে

দিছে না স্যার হে, দুইহাত পাতাইয়া দুইখান ডিম খাইলাইছে। আমি যদি আপনারে কই, তে আমারে পথে দি আমার বাড়ীত যাইতে দিত নায়। পথ নাক ফাটাই লাইব আমার। অতা বিচার করি দিবা আপনে স্যার।

বহুৎ দিন পরে হউ ইসকুলর হউ পুয়াগুর খবর লইলাম, পিটাপাটা খাইছে নি। না, হেডস্যারর ডরে হে উল্টা পড়াত অত ভালা অইছে, একেবারে ইসকুলর শেষ পরীক্ষাৎ পরতম্ জায়গা দখল করি সুনাম করিলাইছে। হুনিয়া অযাৎ ভালা লাগিল কিতা কইতাম। বাক্কা ভালা পড়াশুনা হয় অউ ইসকুল।

* * * *

নারী ও ধরণী

▣ প্রদীপ্তা চক্রবর্তী

আমি সৃষ্টি, আমি একজন স্কুলের শিক্ষিকা। আমি আজ প্রথমবার রেলে আমার বাপের বাড়ি যাচ্ছি সাথে আমার বর ও আমার ৫ বৎসরের মেয়ে। আমরা শহরে থাকি, আমার বাপের বাড়ি গ্রামে। কিন্তু সেটাকে আর এখন গ্রাম বলা চলে না। এখন সেখানে রেল যাওয়া আসা করে কিন্তু এখনো কোনো বড় স্টেশন হয়নি। ঐ গ্রামের রাস্তা দিয়েই রেল চলেছে শহরের পথে। আমি জানালার ধারের সিটে বসে আছি, আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে আমার বর বসে আছে জানালার অপর পাশে আমার (Opposite) এ। ছোটবেলায় রেল নাম শোনতাম কিন্তু আজ নিজে রেল চড়ছি। জানালার পাশে বসে আমি খুব সুন্দর করে খোলা প্রকৃতিটাকে অনুভব করতে পারছি। ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যে গাছগুলো রয়েছে মনে হচ্ছে ওরা যেন গগনকে স্পর্শ করতে চলেছে। মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে, একদিকে সাদা মেঘ, অন্যদিকে সবুজ বনানী তার উপর ভেসে যাচ্ছে সাদা বকের দল, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম এই প্রকৃতির মহিমায়। হঠাৎ চোখে পড়ল পাকা ধানের ক্ষেত। দেখতে পেলাম কৃষকরা মাথায় ছাতা পরে হাতে কাঁচি নিয়ে পরনে গামছা আর উন্মুক্ত বদনে ছুটে আসছে দলে দলে ধান কাটবার জন্যে। একদিকে ধানের ক্ষেত অন্যদিকে দেখতে পেলাম একটি বাড়িতে নানা রঙ বেরঙের সিল্কের কাপড়, বা স্ক্রিন বলা চলে ফুল পাতা দিয়ে সাজানো হচ্ছে আবার যেন সানাইয়ের আওয়াজও আসছিল। হঠাৎ এইসব দেখে আমি নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম মনে হতে থাকল আমার শৈশব, আমার কৈশোর। হঠাৎ যেন চোখ হতে অশ্রু বেরিয়ে এল। মনে একটা ছটফট একটা বেদনা মনকে আঁকড়ে ধরল। আজ থেকে ২৫ বছর আগের ঘটনা। যখন আমার জন্ম হয়েছিল এক ব্রাহ্মণ পরিবারে, আমাদের যৌথ পরিবার ছিল। আমি পরিবারের ছোট মেয়েছিলাম মার মুখে শুনেছি ছোটবেলা আমি খুব চঞ্চল ছিলাম. কোনোভাবেই

আমাকে ঘরে আটকে রাখতে পারতেন না। যখন আমি কোলে ছিলাম তখন তো ভালো ছিলাম। বিছানায় রাখলে শুধু হাত পা নাড়াতাম। কিন্তু যখন হাঁটা শিখে নেই তখন গুটি গুটি পায়ে সারা বাড়ি হেঁটে বেড়াতাম। সকলের আদরের ছিলাম আমি। আমার জন্ম থেকে ১ বছর ও ২ বছর কেমন কেটেছে আমার এতটা মনে নেই কিন্তু আমার ঐ দিনটার কথা মনে আছে যখন আমি ৩ বছরের ছিলাম। আমি পুকুরের জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাগ্যিস আমার দাদু ছিলেন তা না হলে আমি হয়তো বেঁচেই থাকতাম না। তখন থেকে যা যা ঘটনা ঘটেছে আমার সব মনে আছে। ওই পুকুরের ওপারে যে একটি ক্ষেত রয়েছে যেখানে কাঁশফুল রয়েছে, নানা রকমের ছোট বড় ঘাস রয়েছে, মধুফুলের গাছ রয়েছে আর রয়েছে লজ্জাবতী গাছ। কিছু কিছু ঝোপ বড়ো বড়ো কয়েকটা কলা গাছ, আম ও গামাই গাছও ছিল। ওই ক্ষেতে যাওয়ার জন্য আমি খুব ব্যাকুল হয়ে পড়তাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল সেটা। আমি সবসময় সকালবেলা উঠে ওই ক্ষেতে যেতাম সবুজ ঘাসের উপর শিশির বিন্দু পড়ে থাকত আমি কখনো হাত দিয়ে বা কখনো পা দিয়ে ওই বিন্দুগুলোকে নাড়াতাম। লজ্জাবতী গাছে আমার আঙ্গুল স্পর্শ করলেই লজ্জায় গাছ একদম মুজে আসত। আমি লজ্জাবতী গাছের গোলাপী বা কখনো সাদা রং-এর ফুল তুলে নিতাম এবং আমার চুলের ঝুটিতে লাগিয়ে নিতাম। খুব ভালোবাসতাম ঐ ফুলগুলোকে। মা আমাকে অনেক বকা দিত সেখানে না যাওয়ার জন্য অনেক ভয়ও দেখাত যে সাপ এসে আমাকে খেয়ে নেবে বা আকাশে যে উড়ছে বাজপাখি সেই বাজপাখিটা এসে আমাকে একা পেলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। মার কথা কেই বা শুনতো। আমার মন যা বলত আমি তাই করতাম। স্কুলে গিয়েও আমার মন পড়ে থাকত সেই ক্ষেতে। যেমন মনে হতো সেই ঘাস মাটি, গাছগুলোর সাথে আমার একটা মনের টান হয়ে গেছে। যাই হোক স্কুলে ক্লাস করতে হত। পড়াশুনায় খুব মেধাবী ছিলাম। সব সময় ফার্স্ট হতাম। তার জন্য প্রতিদিন ১০টা থেকে ৪টা ক্লাস করতে হত। স্কুল ছুটি হবার পর আমি বাড়ি এসে ছুটে চলে যেতাম সেই মাঠে। সেখানে গিয়ে নরম ঘাসের উপর আমি শুয়ে থাকতাম। কলাগাছের পাতাকে টেনে নিচে নামিয়ে আমি ওদের সাথে অনেক খেলা করতাম। কারণ আমার কোনো খেলার সাথি ছিল না। আমার সব দাদাদিদিরা পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ওরা ওদের শৈশব ও কৈশোর কাটিয়ে ফেলেছিল। আমার তখন শৈশব ও কৈশোরের মধ্যযুগ চলছিল। আস্তে আস্তে আমার শৈশব শেষ হয়ে গেল এখন কৈশোরও শেষ হওয়ার পথে আমি ক্লাস ১২-এ পড়ি। আমি এখনও সেই মাঠে ঘুম থেকে উঠে যাই এবং স্কুল থেকে এসেই ছুটে যাই সেই মাঠে। কি বলব এই মাঠ-ই তো আমার প্রিয় বন্ধু। আমি কখনো কখনো ভাবি আমার যেন এই মাঠকে নিয়ে এত ভালোবাসা, এত টান হয়ত বা এই মাঠেরও আমাকে নিয়ে ঠিক একই রকম ভালোবাসা ও টান রয়েছে। একদিন আমি দরজার ফাঁকে আঙ্গুল চাপ লাগায়

অনেক ব্যথা পেয়েছি কিন্তু আমি কাঁদতে পারিনি কারণ আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি বলে। সেদিন আমি ভাবলাম যে আমি শৈশবে সেই মাঠ থেকে অনেক সময় গাছ উঠিয়ে নিতাম বা কোনো কিছু নিয়ে মাটিতে দাগ কাটতাম তখন মাটিও আমার মতোই কষ্ট পেয়েছিল কিন্তু কাঁদতে পারেনি আমার মতো।

আর কিছুদিন পর আমার উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা একটু ব্যস্ত হয়ে গেছি। সেই মাঠকে আমি প্রতিদিন দেখি কিন্তু ওদের সাথে আর সময় কাটাতে পারি না। দূর থেকে দেখে আসি আর মনে মনে বলি আমার পরীক্ষা শেষ হলেই আমি যাব। মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় মাঠও আমার জন্য অপেক্ষায় বসে আছে কখন আমি যাব ভেবে।

আজ আমি শেষ পরীক্ষা সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরছি হঠাৎ দেখি ২টা বড়ো গাড়ি আমার বাড়ির পাশে। দূর থেকে দেখতে পেয়েছি অচেনা মুখ। মনে মনে ভাবছি ওরা কারা আমাদের বাড়িতে এল তা ভেবে ভেবে আমি ঘরের সামনে এলাম অমনি আমার বড় দিদি আমাকে দেখে বলল ওই তো সৃজি এসে গেছে বলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল আমার রুম-এ। নিয়ে গিয়ে কিছু না বলে আমাকে সাজাতে শুরু করল। আমি তো হতভম্ব ! আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কি হচ্ছে আমার সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম দিদি কি হচ্ছে এটা আমাকে সাজাচ্ছ কেন ? দিদি বলল তোকে দেখতে পাত্র পক্ষ এসেছে। আমি তো শুনে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি কোথায় আছি। আমি শেষ পরীক্ষা দিয়ে কত স্বপ্ন নিয়ে আসছিলাম যে আমি রেজাল্ট এর পর উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে পড়তে যাব, আমি একজন প্রফেসর হব। চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এক ঝলকে সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আমার দিদিরও অনেক আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দিদি পড়াশোনায় তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু আমি তো ভালো ছিলাম। আমারও কি একই ভুল আমি মেয়ে ? এইসব কথা ভাবছি আর সেই মাঠের দিকে হঠাৎ চোখ গেল দেখি বাবা সেই মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে আর সাথে আরো অনেকজনও ছিল। দিদিকে বললাম বাবা সেখানে কি করছে। দিদি বলল তোর বিয়ের জন্য টাকা দরকার তাই বাবা ঐ মাঠটা বিক্রি করে দিচ্ছে এক কৃষকের কাছে। একথা শুনে মনে হচ্ছিল যে ঝড় শুধু আমার জীবনে আসেনি, মাঠের জীবনেও এসেছে। চোখ ফেটে এল জল। কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতায় ভেসে থাকলাম আমি। পাত্রপক্ষ আমাকে প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেল। বিয়েও ঠিক করে গেল ওরা। আগামী মাসে আমার বিয়ে। আমি আর আগের মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াই না। ছুটে বেড়াব বা কি নিয়ে ! স্বপ্ন ভাঙ্গা মন নিয়ে ? আমি আর মাঠের ভেতর যেতে পারি না কারণ সেখানে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি আমার পায়েও শৃঙ্খল পরানো হয়ে গেছে আশীর্বাদ করে। আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে মাঠকে দেখি আর ভাবি যে আমার একা কষ্ট নয়, মাঠও

আমার মতোই একই কষ্টের সাথী। এখন আর সেই মাঠে কেউ খেলতে যাবে না কারণ এবছর থেকে ধান চাষ করা হবে। মাঠ ও ভেবেছিল যে এখানে গাছগুলো বড়ো হয়ে একটা ছোট অরণ্যরূপ নেবে কিন্তু তা আর হল না। কাল আমার অধিবাস আমি কাল থেকে নতুন জীবনে পা বাড়াতে শুরু করব। তবুও মাঠ-এর পাশে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। আমি অনুভব করতে পারলাম একটা মুখবন্ধ বুক ফাটানো কান্না। আমি বেশিক্ষণ সেখানে থাকিনি। কারণ আজ অধিবাসের পর বিয়ে পর্যন্ত আমার বাড়ির সীমানা থেকে বের হওয়া নিষেধ। অধিবাস হয়ে গেল। আমাকে গয়না পরানো শুরু হয়ে গেল। এক এক করে গয়না আমার শরীরে জড়ানো হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি একটা কর্তব্যে বাঁধিত হচ্ছি। পায়ে তো শৃঙ্খল আগেই পরানো হয়েছিল আজ আবার তার উপর নুপুর পরানো হচ্ছে। হাতে শাঁখা তারপর লাল রঙের পলা পরানো হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম আগে শাঁখা পরে পলা কেন ? ওরা বলল শাঁখাকে সবকিছুর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য পলাকে আগে দেওয়া হয়। ঠিক যেমনি স্বামীর মঙ্গল কামনা করে তুই ব্রত করবে, না খেয়ে উপোস করবে, স্বামীর বিপদে পাশে থাকবে। আরো অনেক কিছু বোঝানো হয়ে গেল আমায়। আমি তখন এই কথাগুলোতে এত মন দেই নি। যাই হোক আজ বিয়ে আমার। আজ সকাল বেলা দেখলাম কৃষকগুলো মাঠে এসে মাঠ পরিষ্কার করতে শুরু করল। কাল যখন আমি একটা একটা করে গয়না পরছিলাম আর নতুন কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধছিলাম আজ ঠিক তেমনি মাঠ থেকে এক একটা গাছ উপড়ে ফেলা হচ্ছে, অধিবাসের সন্ধ্যায় স্নানের মতো আজ মাঠকে জলসেচ করা হচ্ছে আজ লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা হবে। মাঠটা কতটা উর্বর তা যাচাই করার জন্য। যখন মাঠের বুক লাঙ্গল দিয়ে চিরে ফেলা হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন একটা চাপা ব্যথা মুখ ফোটে বলতে পারছে না। কিন্তু সহ্য করে চলেছে হাসিমুখে। যথারীতি নিয়ম অনুসারে আনন্দ উল্লাস-এর সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন হল। সবাই অনেক খুশী। আমাকে আরেক ঘরে দেয়া হয়েছে। আমি একা বসে আছি আর ভাবছি আজ তো আমার সতীত্ব পরীক্ষা নেবার দিন। জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। ঠিক যেমন সকালবেলা মাঠের উর্বরতা যাচাই করা হল লাঙ্গল দিয়ে মাঠের বুক চিরে। বর এসে ঘরে ঢুকল। মনে অনেক চিন্তা হচ্ছিল। এখন আমার পরীক্ষা দেবার সময় এসে গেছে। সতীত্ব প্রমান দিতে গিয়ে বেদনায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল তবুও হাসিমুখে সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। পরের দিন আমাকে বিদায় দিয়ে দেয়া হল। শেষবারের মতো সেই মাঠের দিকে তাকিয়ে আমি চলে যাই সবকিছু ছেড়ে নতুন জীবনে পদার্পন করতে। এই জীবনে আমি কারো উপর নির্ভর করার অধিকার নেই এখন আমাকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে। নতুন প্রজন্মের ভার নিতে হবে। ঠিক যেমন মাঠটি ধানক্ষেতে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আজ বিয়ের ৭ মাস হয়ে গেল। আজ আমি গর্ভবতী। নতুন প্রাণ পৃথিবীতে

আনতে চলেছি। আজ আমার গর্ভে থাকা শিশুটি পা দিয়ে নড়াচড়া করে আমি বুঝতে পারি। চোখ মুখ কান ফুটে গেছে। ঠিক যেমনি মাঠটি এখন ধানক্ষেতে পরিপূর্ন হয়ে গেছে। ধানগাছ গুলো বাতাসের সাথে নড়াচড়া করে। এদিক থেকে ওদিকে দুলতে থাকে সবুজ ধানগুলো এখন হলুদ ধানে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মাঠকে দেখতে এখন অনেক খুশি আছে মনে হয় ঠিক যেমনি আমি আমার আগামী প্রজন্মকে নিয়ে খুশি। আমাকে আমার শ্বশুড় বাড়ির লোকজন অনেক আদর করে ও অনেক যত্ন করে কেননা আমি নতুন প্রজন্ম আনতে চলেছি আমি একজন মা হতে চলেছি। ঠিক তেমনি সেই মাঠকেও কৃষক অনেক যন্ত করছে সার ছিটিয়ে দিচ্ছে কারণ মাঠ এবার ধান দিতে চলেছে।

আর দুদিন তারপর আমার ডেলিভারী হবে। অনেক চিন্তাও হচ্ছে কী হবে কী না। তবুও আমাকে আমার বর সাহস যোগাচ্ছে। ধান কাটারও সময় এসে গেছে। মাঠটিও আমার মতো চিন্তিত। কিন্তু কৃষক এসে প্রতিদিন গরু ছাগল তাড়িয়ে ধান গাছকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে যে সঠিক সময়ে ধান কেটে নেওয়া হবে এর আগে কোনো ক্ষতি হবে না ধান গাছের। আজ আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্যদিকে কৃষকরা ধান কাটার জন্য কাঁচি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। অনেক ব্যথা বেদনার পর আমি যেন হঠাৎ শুনতে পেলাম একটি শিশুর কান্না। তার পরই আমার থেকে আমার সন্তানকে বার করা হল নাড়ি কেটে। ঐ যে ব্যথা ঐ যে বেদনা শুধু একজন মা-ই অনুভব করতে পারে। তা আর কেউ অনুভব করতে পারে না। ঠিক যেমনি সেই মাঠ থেকে ধান গাছ গুলো কেটে নেওয়া হচ্ছিল ঠিক যেন মা-এর নাড়ি কেটে সন্তানকে বের করার মতো। সেই মাঠটিও বেদনায় ছটফট করছিল কিন্তু কেউ তা অনুভব করতে পারছিল না। আমি যেমন একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে সবাইকে খুশি করেছিলাম ঠিক তেমনি ধরণীরূপী সেই মাঠ ধান দিয়ে সবাইকে খুশি করেছিল।

আমি যেমন একটি মেয়ে থেকে একজন মা হয়েছি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে। ঠিক তেমনি আমার সন্তানটিও একই পথে চালিত হবে। সেই মাঠটিও ধরণীরূপে শস্য ফলিয়ে যাবে।

আজ কয়েক বছর পর একই দৃশ্য ধানক্ষেত আর বিয়ে বাড়ি দেখে আমার অস্তিত্ব চোখে ভেসে উঠল। অতীত বর্তমানে এসে পড়ল। হঠাৎ আমার মেয়েটি আমার কাছে এসে বসল। বলল মা আমরা এসে গেছি এখানেই ট্রেন থামবে। কিছুক্ষণ পর ট্রেন থামল। আমরা বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে সেই মাঠে গেলাম। সেখানে আমার শৈশব কেটেছে। কিন্তু সেখানে আর গাছপালা, ফুল নেই শুধু শস্য আর ধান। কিছুক্ষন বসার পর নিজেই একটা অবসাদ ভরা হাসিতে হেসে উঠলাম। এটা ভেবেই হেসে উঠলাম যে আমি একজন নারী আর এই মাঠটি ধরণী - একজন নারী।

শিবের ঘর

▣ সঞ্জয় চক্রবর্তী

বর্ষা গেল শরৎ এল,
ফুটল কত ফুল,
চারিদিকে বাজছে শুধু
ঘন্টা কাঁসর ঢোল।
নদীর পারে ফুটছে দেখ
সাদা কাশ ফুল,
শিশির পড়তে এ সময়ে
হয়নি কোন ভুল।
মা আসবেন বলে জাগে
সবার মনে আশা,
অনেক দুঃখী আছে
দেখ হয়ে নিরাশা।
বড়লোকের পূজা বড়
অনেক সাজ গোজ,
গরীব যারা আছে দেখ
নেয় না কোন খোঁজ।
কৈলাসেতে আছেন মা
গরীব শিবের ঘর;
নতুন কাপড় দেয়না শিবে
ঋণের বড় ডর।
কাতু-গনু বলেছে বাবা
কোট প্যান্ট এবার চাই,
ধুতি পরে মর্ত্য লোকে
সম্মান নাহি পাই।
সতু-লখু বলে এবার
মডেল হব ভাই
এবার পূজায় দেখাবো মোদের
পয়সার অভাব নাই।
শিব বলে দেখরে তোরা
বাড়াসনে আর আড়ম্বর,
বাঘের ছাল ছোট হক
আমি নইতো দিগম্বর ।
কাতু-গনু শুনে বলে
বলছ কি বাবা,
'বন্যপ্রানী' আইন হয়েছে
মর্ত্যে পড়বে ধরা।
শিব বলে হেসে হেসে
বুদ্ধি আমার আছে,
স্মাগলারদের সাথে আমি
যোগ দেব শেষে।
সতু-লখু বলে বাবা
লজ্জা তোমার নাই,
মাসির পায়ের নীচে আছো
মায়ের ত্রিশূল চাই ?
দেশ ভর্তি মিডিয়া বাবা
ঘুরছে সব জায়গায়,
'তোহলকা' কান্ড ঘটলে
কৈলাসে থাকা দায়।
শিব যে হলেন দিশাহারা
শান্তি নাই তার ঘরে,
বিশ্বায়নের যাঁতাকলে
দেবতারাও মরে।

অন্য কবিতা

▣ স্বপন ধর

অন্য কবিতা লিখছি আমি
কিছু চায়ের কাপে ভিজিয়ে, কিছু ঠোঁটের গোঁড়ায় জড়িয়ে
কিছু অচেনা শব্দ লিখছি আমি
ভাবনার গভীরতা উড়ছে দিক-দিগন্ত পেরিয়ে,
হয়তো দেওয়ালের অপারে আছে কিছু লুকিয়ে
জানতে হবে, বুঝতে হবে
কলমের ডগায় কথা সাজিয়ে আজ লিখতেই হবে।
তবুও মন অশান্ত
আরও কিছু চাইছে নিজের মতো,
জানে না সে ঠিকানা, জানে না সে পরিচয়
শুধুই যেন করছে আজ সময়ের অপচয়।
হোক বসন্ত, পাতাগুলো চাপা পড়ুক মাটির ভাঁজে
তবুও সে ছুটবে নতুন খুঁজে
হোক অমাবস্যার অন্ধকার কিংবা কোনো গণ্ডী সার্থকতার
থাকুক পিছুটান কিংবা বাধ্যকতা
আজ লিখবো এক অন্য কবিতা।

খোলা চিঠি

▣ পুষ্পা দাস

বাবু,
তোমায় খুঁজেছিলাম গা,
সবাই তো পাগলি বলে
ইট পাথর ছুঁড়ে মারে
পথের ধারে জড় বস্তু
দেখেও তো কেউ দেখে না গা।

তুমি আমায় দেখেছিলে
রাত্রি তখন দুটো বাজে
পাগলি বলে হেয়ো করোনি
মেয়ে মানুষি শরীরটকে।

তবে তুমি কোথায় গেলে
দিনের আলোয় লুকিয়ে গেলে
বাবু তোমায় বলার ছিল
পাগলি বলে যে ঘেন্না মেলে।
শরীরের এই পরিবর্তনে সবাই কেন হাসে গা ?

বাবু,শুনেছি পুরুষ শরীরে জন্মবীজ
শুনেছি পুরুষ নাকি দেয় জীবনী সুধা,
ও বাবু...
তবে আমার শরীরে বিষ কেন গা ?

সেন্টিমেন্ট

▣ অর্ণব ভট্টাচার্য্য

খামের পালকে মোড়া এই আচ্ছাদন
ছুচ্ছে তোমার ক্লান্ত দেহ
কলম হাতে পাতায় পাতায় ছুটছ তুমি
স্পর্শ করছো সেই বিরহ
বহুদিনের বিষ লেগে আছে কণ্ঠে
গালাগাল দিয়ে টানছো বর্ডার
জবাব বন্দি হয়েছে পুরোনো খামে
তবুও করছে সারেন্ডার
চোখের নাগালে জমে আছে ডিপ্রেসন
তাই কাঁটা পড়েছে ডানা
কতদিন আর ঠোঁটে ঠোঁট কামড়াবে
ফাঁস হবে মোড়কের আড়ালে সেই ইম্প্রেসন
হাতের কলম লোহার শেকলে বন্দি
না হয় করবো না কোনো কমিটমেন্ট
আবার এগিয়ে আসবো
কারণ আমার নেই কোনো সেন্টিমেন্ট।

পূর্ব পুরুষের সন্ধানে

▣ দীপঙ্কর গুপ্ত

আক্ষরিক অর্থে প্রাইমেট মানে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী গোষ্ঠী। যা স্তন্যপায়ী শ্রেণীর একটি বর্গ। যার অন্তর্গত প্রভৃতি প্রাণীরা হল - লিমার, লরিস প্রভৃতি প্রাণী থেকে আরম্ভ করে বানর, বনমানুষ বা এপ রয়েছে। এমনকি বিজ্ঞানীরা মানুষকেও এই বর্গে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

এখন দেখা যাক এপ ও মানুষের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

বিজ্ঞানী ওয়েনের মতে মানুষের মস্তিষ্কের গঠন অদ্বিতীয়, কেননা মানুষের মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস নামে একটি অংশ রয়েছে যা বনমানুষ বা এপদের নেই। কিন্তু এই ধারণাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানী হাক্সলে প্রমান করেন যে হিপোক্যাম্পাস এপদেরও আছে। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক স্টার্ক দেখিয়েছেন যে, এপ ও মানুষের মস্তিষ্কের পার্থক্য মূলত গুণগত নয়, তা পরিমাণগত।

দ্বিতীয়ত, গঠনগত পার্থক্য ছাড়াও মনে করা হত যে, এপ-রা মানুষের মত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে না, তাদের বোধশক্তি সীমাবদ্ধ আর তারা মানুষের মতন কথা বলতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানী জেন গুডল দেখেছেন যে, গোম্বে-তে বন্য শিম্পাজীরা সরঞ্জাম ব্যবহার করে। গার্ডনার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রতীকের সাহায্যে বা কোনো কাজের সাহায্যে শিম্পাজীর সঙ্গে মত বিনিময় করতে সক্ষম হয়েছেন। এইসব পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, শিম্পাজী অচেনা জিনিসের নাম জানতে চায় বা অজানা পরিস্থিতিতে নিজের প্রতিক্রিয়া জানায়। গার্ডনারদের শিম্পাজী মাত্র দশ সপ্তাহ বয়সে চারটি কথা বলতে পারত - এসো, যাও, আরো, জল। কোনো মানব শিশু তা পারে কি ? তবে কোন সুবাদে বলা যাবে যে এপ-দের বোধশক্তি সীমাবদ্ধ ? অবশ্যই এপ-রা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু সেটা মস্তিষ্কের গঠনের জন্য না গলার স্বরতন্ত্রীর গঠনের জন্য সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন।

তৃতীয়ত ও সর্বশেষ জৈবরাসায়নিক বা জেনেটিক পার্থক্য। শিম্পাজী ও মানুষ দুটি প্রজাতি, দুটি গণ, এমনকি দুটি গোত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে জৈব রাসায়নিক পার্থক্য খুবই কম। সারিখ, ক্রোনিন, উইলসন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, বেশ কয়েক ধরণের প্রোটিনের ক্ষেত্রে মানুষ আর শিম্পাজীর অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলের গঠন একেবারে এক। যেমন মানুষ আর শিম্পাজীর ফাইব্রিনোপেপটাইড একেবারে এক। হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনের ক্ষেত্রেও প্রায় পার্থক্য নেই বললেই চলে।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট যে, প্রাইমেটদের মধ্যে গঠনগত ও জৈব

রাসায়নিক ক্ষেত্রে মিল যথেষ্ট। কিন্তু তার মধ্যে ক্যাটারাইন বানর, এপ আর মানুষের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ট। আবার ক্যাটারাইন বানর আর এপদের পার্থক্য তুলনামূলকভাবে এপ ও মানুষের পার্থক্যের তুলনায় অনেক বেশী। বিশেষ করে, মানুষ ও আফ্রিকার এপ গোষ্ঠী সবচেয়ে ঘনিষ্ট। তার মধ্যে মানুষ ও শিম্পাজী ঘনিষ্ঠতম।

তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, মানুষ আর আফ্রিকান এপ বিশেষত শিম্পাজীর গঠন হুবহু একরকম। তাদের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমত - এপদের হাতের তুলনায় পা ছোট যা মানুষের ঠিক বিপরীত। দ্বিতীয়ত - এপদের পা শ্রেণীচক্রের গঠন অন্যরকম, কারণ তারা মানুষের মতন খাড়া দুপায়ে হাঁটে না। তৃতীয়ত - এপদের আঙ্গুল অনেক লম্বা। চতুর্থত - এপদের কেবল হাতের নয়, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ও বৃক্ষচারী হবার ক্ষেত্রে সহায়ক। পঞ্চমত - এপদের মুখ তুলনায় ছুঁচালো আর চোখের উপরে কপালে খাঁজ আছে। সবশেষে 'এপ'দের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট আর অপরিণত।

মাটির তলা থেকে নুড়ি পাথর ও বিশেষভাবে গঠিত কুড়ালের ফলা ইত্যাদির অস্তিত্বের কথা মানুষের জানা ছিল অনেকদিন থেকেই। কিন্তু সেগুলি কতদিনের পুরানো ? এগুলি তৈরী করেছিল কে ? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সে সময়ে সম্ভবও ছিল না। তৎকালীন বড় প্রশ্ন ছিল এগুলি যদি প্রস্তর যুগের আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্র বা সরঞ্জাম হয়, তবে সেই আদিম মানুষের দেহাবশেষ কোথায় গেল ? গত ১৫০ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন নানাভাবে।

[তথ্য সংগৃহীত : "জীব বিবর্তনের ইতিহাস"- প্রসাদ রঞ্জন রায় ও আনন্দ ঘোষ হাজর]

Nirman Tripura Const. & Consultancy (NTCC)
Dharmanagar, North Tripura
(A Govt. Registered Firm)
ntccdmr@gmail.com
Mriganka Bhattacharjee (Civil)
Swapan Dhar (Civil)
Utpal Nath (Civil)
Arindam Sarkar (Arch)
9863372497, 8974949728, 8974757860

রক্ত সঞ্চালন ও তার ব্যবহারিক দিক

▣ ড. শান্তনু ঘোষ

রক্ত সঞ্চালন বলতে বোঝায় কোনো এক ব্যাক্তির(দাতা) শরীর থেকে রক্ত নিয়ে দ্বিতীয় কোনো ব্যাক্তিকে দান করা। এটি নানা কারনে করা হয়ে থাকে,যেমন বড়মাপের শল্যচিকিৎসা, সন্তান প্রসব বা গুরুতর দুর্ঘটনা ইত্যাদি। এছাড়াও যখন অ্যানিমিয়ায় অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি বিফল হয় অথবা জন্মসূত্রগত রক্ত সংক্রান্ত রোগ যেমন থ্যালাসেমিয়া বা সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগেও এটি ব্যবহৃত হয়। রক্ত সঞ্চালনও বিয়ের মতো ; এটিকে কখনো লঘুভাবে বা অনুপদিষ্টভাবে নেওয়া উচিৎ নয়;শুধুমাত্র আবশ্যক প্রয়োজনেই ইহা ব্যবহার করা উচিৎ। দিন দিন ক্রমাগত রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমানভাবে নিরাপদ হচ্ছে তবুও এটি এখনো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। এর ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রকার জটিল সংক্রমন বা অসংক্রমন জনিত রোগের ঘটনা যা অনেকসময় প্রাননাশের জন্য দায়ী। অতীতে রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রক্তই সঞ্চালিত করা হতো ; কিন্তু বর্তমানে রক্তের বিভিন্ন উপাদান আলাদা ভাবে সঞ্চালিত করার জন্য এই প্রকার ঘটনা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও এর ফলে এলার্জি সংক্রান্ত সমস্যা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি রক্ত সঞ্চয় করে রাখার সময়কালও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারনত বর্তমানে রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে আলাদা ভাবে প্ল্যাটলেট, প্লাজমা ও লোহিত রক্তকনিকা ব্যবহার করা হয়।

লোহিত রক্ত কনিকা সঞ্চালন ঃ

যে সব রোগীর ক্ষেত্রে শরীরে লোহার অভাব বা অ্যানিমিয়া রয়েছে; অর্থাৎ যখন শরীর স্বাভাবিক ভাবে লোহিত রক্তকনিকা তৈরী করতে অক্ষম হয় তখন ঐ ব্যাক্তিকে লোহিত রক্তকনিকা দেওয়া হয়। এই ধরনের সঞ্চালনের ফলে রোগীর দেহে হিমোগ্লোবিন বা লোহার পরিমান বেড়ে যায়, পাশাপাশি দেহে অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি পায়।

প্ল্যাটলেট সঞ্চালন ঃ

প্ল্যাটলেট হচ্ছে রক্তের সেই অংশ যা রক্তপাত বন্ধকরে। সাধারনত যেসব রোগী লিউকোমিয়া বা অন্যান্য ক্যান্সারে ভোগে তাদের প্ল্যাটলেট কম হয় যা তাদের কেমোথেরাপীর উপর প্বার্শপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেহেতু তাদের শরীরে সাধারন প্রক্রিয়ায় প্ল্যাটলেট তৈরী হয়না তার জন্য কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনের সাহয্য নেওয়া হয়।

প্লাজমা সঞ্চালন ঃ

প্লাজমা রক্তের তরল অংশ।এটি বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন ও অন্যান্য

পদার্থ নিয়ে গঠিত যা কোনো ব্যাক্তির সঠিক স্বাস্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সাধারনত রক্ত সঞ্চালনে রোগীদের কোনো শারিরীক সমস্যা হয় না। যদিও কখনো কখনো ছোট বড় সমস্যা হলেও হতে পারে - যেমন-

এলার্জি সমস্যা

কোন কোন লোকের একই গ্রুপের রক্ত দেওয়ার পরও এলার্জির সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যা দূরিকরনের ঔষধ হিসাবে অ্যান্টি-হিমাটন ব্যাবহার করা হয়।

জ্বর

শ্বেত রক্তকণিকার জন্য রক্তসঞ্চালন কালে জ্বর হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এর সাথে যদি বমি বমি ভাব বা বুকে ব্যাথা হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

তীব্র রক্ত গঠিত অনাক্রম্যতার প্রতিক্রিয়া বা একিউট ইমিউন হিমোলাইটিক রিয়েকশান

এটি একটি গুরুতর কিন্তু খুব দূর্লভ পরিস্থিতি যখন কোন রোগীর দেহে সঞ্চালিত রক্তেকে ঐ ব্যাক্তিরই লোহিত রক্তকণিকা আক্রমন করে। এর ফলে কিডনীর ক্ষতি হয়। রক্তের গ্রুপ ঠিকঠাক না মেলালে এই সমস্যা হয়। এর লক্ষণ হচ্ছে বমি বমি ভাব, জ্বর, ঠান্ডা লাগা, বুকে পিঠে ব্যাথা এবং গাঢ় রঙের প্রস্রাব।

রক্তগঠিত সংক্রমন

রক্তদানের পর সকল রক্তই ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও পরজীবীর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। এর পরেও রক্তে সংক্রমন ঘটতে পারে। রোগজীবানু ধ্বংস করার জন্য প্রতিনিয়ত কঠোর পরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। বর্তমান পদ্ধতিতে রক্তে সারলেন্স (Psoralens) বা রিবোফ্লেভিন মেশানোর পর তাকে অতি বেগুনী রশ্মিতে আলোকপাত করা হয়। রক্তগঠিত প্রতিক্রিয়া বন্ধকরার জন্য বিভিন্ন প্রকার আধুনিক নির্দেশক ব্যবহৃত হচ্ছে। রক্তসঞ্চালনের যে অগ্রগতি হয়েছে তা এক দশক আগে ভাবাও যেতো না। বর্তমানে রয়ে যাওয়া বাকি সমস্যাগুলিও অদূর ভবিষ্যতে সমাধান ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

= = =

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

▣ রূপম দেবনাথ

১। স্পেনিস বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করলেন 'এন্টিজিকা ড্রাগ'

বহু গবেষণার অবশেষে আবিস্কার হল মরণাত্মক 'জিকা'-র এন্টি-ড্রাগ। বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বব্যাপী 'জিকা-ভাইরাস' এবং তার প্রভাব নিয়ে গোটা বিজ্ঞানজগৎ-কে এক কঠোর দ্বারে নিয়ে ফেলেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জিকা-ভাইরাসের প্রতিষেধক ড্রাগ আবিস্কারের কথা ঘোষণা করলেন। সান এন্টোনীয় ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যারা বায়োইনফরমেটিক্স এবং হাই পারপরমেন্স কম্প্যুইটিং' নিয়ে গবেষণা করছেন জানান যে, মশা-বাহিত রোগ প্রতিরোধক এমন একটি এন্টিবায়োটিক যা জিকা প্রতিষেধক হিসাবে কাজের প্রমাণ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জিকা-ভাইরাস প্রোটিন এবং তার আনবিক গঠন সম্পর্কিত অজানা তথ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বাধা প্রদান করেছিল। সত্ত্বা আবিস্কৃত 'রেপ্লিকেশন' পদ্ধতি জিকা-ভাইরাস প্রতিষেধক ড্রাগ গবেষণার পথ সুনিশ্চিত করে।

২। 'সুহোম' এক উন্নত নবজাতক শ্রবন যন্ত্র Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology-র অন্তর্গত ভারত সরকার স্বীকৃত School of International Biodesign (SIB), এক অভূতপূর্ব উন্নত যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা এক নবজাতকের শ্রবণ অনুভূতি পর্যবেক্ষণে সক্ষম। AIIMS এবং IIT Delhi-র যৌথ উদ্যোগে এবং BCIL-র প্রযুক্তিগত সহায়তায় ভারত সরকারের এই প্রকল্পটি সার্থক রূপ ধারণ করেছে। 'সুহোম' এমনই একটি সাশ্রয়কর এবং উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র। Prithvi Bhavan M/S Sohom Innovation Lab & Ind Pvt. Ltd. চলতি বছরের 17th July Prithvi Bhavan-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ভূ-বিজ্ঞান, ভারত সরকারের মাননীয় মন্ত্রী Sri Y.S. Chowdary 'সুহোম' -এর প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

৩। 'ম্যাসস্পেক পেন' - ক্যানসার শনাক্ত করণে

মরণাত্মক ব্যাধি ক্যানসার রোগীর শরীরে ঠিক কতটা দূর ক্যানসার কোষ ছড়িয়ে তা সনাক্তকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী গবেষকরা সম্প্রতি এক যন্ত্রের আবিস্কার করেন যা মাত্র ১০ সেকেন্ডে ক্যানসার কোষ শনাক্তকরণে সক্ষম। 'ম্যাসস্পেক পেন' নামক এই ছোট যন্ত্রটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নিখুঁতভাবে ক্যানসার কোষ অপসারণ করতে পারবে। গবেষকদের মতে যন্ত্রটি খুবই পরিপাটি ও সাধারণ। যন্ত্রটি ব্যবহারে খুব কম সময় ব্যয় করতে প্রয়োজন হয়। মোট

২০[redacted]মুনার উপর যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে যন্ত্রটির আরও উন্নয়নে গবেষকরা তাদের গবেষণামূলক পরীক্ষা অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

৪। পাখীর ন্যায় দৃশ্যমান নতুন প্রজাতির ডায়নাসরের খোঁজ -

সম্প্রতি কানাডিয়ান বৈজ্ঞানিকরা এক নতুন প্রজাতির ডায়নাসরের খোঁজ পেয়েছেন যা পাখীর ন্যায় দৃশ্য। বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় ৭১ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এদের বাস ছিল। এদের আকার অনেকটা একজন মানুষের ন্যায় ছিল। নতুন প্রজাতি 'Albert avenator currie'. যার অর্থ "Currie's Alberta hunter", বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ Philip J. Currie-র সম্মানার্থে এই নুতন প্রজাতির নামাকরণ। কানাডার Alberta-তে এই প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা জানান, Alberta avantor, 'Troodon' নামক পাখী-সদৃশ ডায়নাসরের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'Troodon' প্রায় ৭৬ মিলিয়ন বছর আগে অর্থাৎ Alberta avantor-র প্রায় ৫ মিলিয়ন বছর আগে বিরজিত ছিল। দুটি প্রজাতিই দু পায়ে চলন দেহ পাখনায় আবৃত এবং দেহের দৈর্ঘ্য অনেকটা একজন মানুষের সমান। জীবাশ্মবিদরা জানান, Alberta avantor-র হাঁড় 'Troodon'-রই অন্তর্গত।

৫। টি-রেক্স দাঁত বিশিষ্ট জুরাসিক যুগের কুমিরের সন্ধান -

সম্প্রতি এক গবেষণায় লুপ্তপ্রায় টি-রেক্স দাঁত বিশিষ্ট জুরাসিক যুগের কুমিরের জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই জীবাশ্মটি প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় কুমির যার বিশাল চোয়ালে হাড়ের সাথে সংযুক্ত ছিল টি-রেক্সর মত দাঁত। বিজ্ঞানীদের এই গবেষণাটি সংঘটিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার 'Madasascar' নামক স্থানে। গবেষণাটি 'Peoy' গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার 'Madasascar' ছিল মধ্য জুরাসিক যুগের মূল ভূমি যখন ডায়নাসোর এই পৃথিবীতে বিরাজমান ছিল। টি-রেক্স এর মত বিশাল চোয়াল এবং করাত দীপ্তির অস্তিত্ব জোরালো প্রমান দেয় যে, এই কুমীর হাড় এবং কন্ডরার মত হার্ড টিস্যু (কলা) সাহায্যেই খাদ্য গ্রহণে সক্ষম ছিল।

৬। লক্ষ লক্ষ টন বহুমূল্য ধাতুর সন্ধান

Geolosical Survey of India (GIS)-র ভূ-বিজ্ঞানী সম্প্রতি এক অনন্য তথ্যের প্রকাশ করেন। তারা জানান, ভারত ঘিরে গভীর সমুদ্রে মজুত রয়েছে লক্ষ লক্ষ বহুমূল্য ধাতুর ভান্ডার এবং ভূ-বিদদের মতে এই বিশাল সংগ্রহস্থল এবং পূর্বে প্রবাহমান এই বিপুল পরিমানের সংস্থান এক নতুন প্রত্যাশার পথ দর্শন করেছে। বিপুল পরিমানের এই সামুদ্রিক সম্পদ সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হয় ২০১৪ সালে। ম্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই, সান্নর বেসিন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ - এর অন্তর্গত ছিল। ভূ-বিজ্ঞানীদের খোঁজে পাওয়া বিপুল পরিমানের চুন কাঁদা, ফসফেট সমৃদ্ধ এবং চুনহীন

পলল, হাইড্রোকার্বন, মেটালফারের আমানত এবং মাইক্রোনোডিউলস স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে খোঁজে পাওয়া যেতে পারে আরও বিশাল পরিমানের গুপ্তধন।

৭। Pluto System-র নতুন তথ্য আবিষ্কার -

২০১৫ সালের ১৪ই জুলাই, NASA-র New Horizon নামক মহাকাশযান সৌরমন্ডলের Pluto System-এ এক ঐতিহাসিক উড়ান সম্পন্ন করে। প্লুটো ও তার উপগ্রহের কাছাকাছি ছবি সর্বপ্রথম এই মহাকাশযান সংগ্রহ করে। এই ঐতিহাসিক উড়ানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে 'Flyby' নামক NASA-র গবেষক দলটি Pluto System এবং New Horizon-র এই তথ্যটি প্রকাশ করেন। তারা Pluto এবং তার সব থেকে বড় উপগ্রহ 'Charon' র বিশ্বমানচিত্রের আত্মপ্রকাশ করেন। বিজ্ঞানীরা New Horizon প্রদত্ত আরও কিছু অজানা তথ্য নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন যার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে আরও নতুন আবিস্কার।

৮। বিশ্বের প্রথম উষ্ণ শোণিত রক্তযুক্ত মাছের সন্ধান -

স্তন্যপায়ী ও পক্ষীর ন্যায় উষ্ণশোণিত রক্তপ্রবাহ যুক্ত মাছের সন্ধান পাওয়া গেল। চিলি'র সমুদ্র গভীরে অন্তত ২০০ মিটার দূরত্বে এই মাছের সন্ধান মিলে। 'Silvery fish' নামক মাছটির দৈর্ঘ্য এবং আকার অনেকটা বড় যানবাহনের টায়ারের অনুরূপ। National Oceanic and Atmospheric Administrations National Marine Ficheries (NOAA) Fisheries-র এক বিশেষজ্ঞ দল এই নতুন প্রজাতির মাছের তথ্যটি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানীদের মতে, এই উষ্ণ শোণিত রক্তবাহ মাছটিকে দ্রুততর সাঁতরানো, তীক্ষ্ম অনুভূতি এবং দৃষ্টিশক্তিতে সাহায্য করে। সাগরের শীতল জলতলে মাছটিকে বসবাসে উপযোগী করে এই উষ্ণ রক্তপ্রবাহ।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-সমাজ

▣ দীপালোক ভট্টাচার্য

মানুষ তার আকাঙ্খার জগতে সব সময় ব্যাকুল। মানুষের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। চাওয়া পাওয়ার এই ইচ্ছার সুবাদে মানুষ তার আকাঙ্খা নিংড়ে দেয় একে অপরের উপর। আজকের যুগের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলছে এই ছাত্র সমাজ। ছাত্র-ছাত্রীদের দায় ভারের দায়িত্ব এখন অনেক। অভিভাবকদের দেওয়া-নেওয়ার শেষ নেই। অভিভাবকগণ নিজেদের উচ্চাকাঙ্খা ঝেড়ে দিচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। ছাত্র-ছাত্রীদের কত দায়িত্ব, চিত্রাঙ্কন, সাঁতার, কম্পিউটার, নাচ-গান আরও কত কি নিয়ে ব্যস্ত। খেলার মাঠে ভীড় কম, খেলাধূলার সময় তাদের নেই, শুধু এটা শিখো, ওটা শিখো, এটা হোম ওয়ার্ক, এটা কমপ্লিট করতে হবে পরীক্ষা সময়ে - ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা রোবট মেশিন থেকেও আরও সাংঘাতিক। অভিজ্ঞতা মানুষকে অনেক কিছুই শেখায় - আমি আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছি শুধু। অভিভাবকদের একটা ঐতিহ্য হয়ে গেছে যে তাদের সন্তানেরা যদি ভালো ইংরেজী, আর্ট এডুকেটেড না হয় - তাহলে পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ পরিবারকে দাম দেবে না।

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলছি দয়া করে তাদের চাপমুক্ত করুন, তাদের খুশিমতো থাকতে দিন - ছাত্র-ছাত্রীরা নিস্পাপ, ওদের রোবট না বানিয়ে বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হয় শেখান, সমাজ-পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে মিশতে দিন।

খোলামেলা পরিবেশে সন্তানদের লালন-পালন করুন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা একটু ছাত্র-ছাত্রীদের চাপমুক্ত রাখুন। ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলার ছলে পড়ান- এটা তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক বিকাশে সাহায্য করবে।

জানি না সব ঠিক ঠাক লেখলাম কি না ! পাঠক মহলের উদ্দেশ্যে বলছি আজকের ছাত্র-ছাত্রী আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার-আমার-সবার, যদি কোনো ভুল লিখে থাকি ক্ষমার চোখে দেখবেন - অনুরোধ রইলো।

ওরা নিস্পাপ, ওরা চঞ্চল
ওরা বাঁচতে চায় -
ওদের বাঁচতে দিন।
আগুন নিয়ে খেলবে ওরা -
ভাঙবে-গড়বে সমাজের দেওয়াল
সাহস দিন, উদ্যম দিন
প্রস্ফুটিত হতে দিন স্ব-ইচ্ছায়

বৃদ্ধাশ্রম

▣ পীযূষ কান্তি চৌধুরী

জন্ম দিয়েছে মা তার আদরের সন্তান,
একদিন বড় হয়ে আগো করবে সংসার
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মা বড় করে তার ছেলে।
পড়াশুনা করে ছেলে একদিন অনেক বড় হবে,
সেদিন সংসারে থাকবে না কোন অভাব অনটন,
আধপেটা খেয়ে মা বড় করে তার ছেলে,
হায়রে কপাল! লেখা পড়া করে ছেলে যায় মাকে ভুলে।
ছেলে বউ আর তাদের আদরের সন্তান
তিন জনে মিলে হয় তাদের সুখের সংসার।
বৃদ্ধ মা বাবার তার আজ নেই কোন প্রয়োজন
সুন্দর সাজানো ঘরে তাদের মানায় না এখন।
লোক লজ্জার ভয় তাদের কিছু হলেও আছে
সময়ের অভাব এই অছিনায় পাঠায় তাদের বৃদ্ধাশ্রমে,
মায়ের দুধের দাম আর কঠোর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম
কোনটিরই মূল্য যে আজ তাদের কাছে নেই এখন।
বৃদ্ধাশ্রমে থেকে মা একটিবার আদরের নাতি দেখতে চায়
মা পাঠায় না ছেলেকে যদি বৃদ্ধার নজর লেগে যায়,
অবশেষে আসে প্রকৃতির নিয়মে সেই দিন
চির বিদায় নিতে হবে আর মাত্র কটা দিন।
চির বিদায়ের চিঠি পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে মা ভাবে
ছেলে বুঝি চিঠি পাঠিয়েছে মাকে বাড়ি যেতে,
সহসাই মায়ের ভুল ভেঙ্গে গেল
ইহ জীবনে আর মায়ের বাড়ি কিবা নাই হল,
বৃদ্ধাশ্রমেই মা করল ত্যাগ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস,
সেই সংবাদ পেয়ে পুত্র বধূর আর্ত চিৎকার,
ব্রাহ্মণের বিধান মেনে গলায় ধরা ধারণ করে,
শ্রাদ্ধ শান্তি করে ছেলে বহু টাকা খরচ করে,
আত্মীয় সজন জ্ঞানী গুণী জন ছিল যত

একে একে সবাই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রন খেতে এল,
ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে করেনা সেথায় কোন ভুল
গাভী দান করে বৈতরিনি পার করে,পার করে কূল।
মায়ের আত্মা হবে এবার নিশ্চই বৈতরিনি পার
স্বর্গের দোয়ার উন্মুক্ত এবার বাঁধা নেই আর,
ছোট নাতি মনে মনে তার ঠাকুরমাকে খুঁজে,
মা বলে তোর ঠাকুরমা চলে গেছে স্বর্গলোকের দেশে।
ছোট ছেলে প্রশ্ন করে মাকে ,বৃদ্ধাশ্রমের রাস্তা দিয়ে বুঝি স্বর্গে যেতে হয় ?
বৃদ্ধাশ্রমটি কোথায় মাগো আমায় চিনিয়ে দিলে ভালো হয়
পাঠিয়ে দেব আমি তোমাদের যখন দরকার হবে
তোমরা যখন বৃদ্ধ হবে করব না মাগো দেরি
বৃদ্ধ হলেই তোম্মাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেব তাড়াতাড়ি।।

২১শে নভেম্বর

▣ দেবজ্যোতি আচার্য্য

শীতের মৃদু হাওয়া গায়ে লাগে
মুখচোরা অনুভূতি পশম আর ওলের দেহে জড়িয়ে থাকে
দুপায়ে সাইকেল চারপায়ে যাত্রা
ভীড়ের সামনে যাত্রার অস্ত।

২১শে নভেম্বর
চামচে Noodles-এ হাসির দাঁত জড়িয়ে থাকে
SMS থেকে স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তর
গলাকাঁটা বাক্য সম্পর্ক বাধার অন্ধকারের সাথে

২১শে নভেম্বর
অপ্রকাশিত যাত্রার বিদায়ক্ষণ
চোখে চোখে অনুভূতির ঘর্ষণ
লিখে অসমাপ্ত কবিতা।

পারাসালসাস

(কিশোর একাঙ্ক নাটক)

▣ রত্নময় দে

চরিত্র :-

পারাসালসাস	-	পিতা
বসন্ত (প্রতীকী)	-	মা
কলেরা (প্রতীকী)	-	পেয়াদা
পথিক	-	উকিল
যোশেফ	-	বিচারক
		ডাক্তার
		১ম ব্যক্তি
		২য় ব্যক্তি

মঞ্চে আবছা আলো। নেপথ্যে ঘোষণা।

ঘোষণা :- অতীত কাল থেকে মানুষ কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। তখন থেকেই প্রতি মুহূর্তে চিরাচরিত ধর্মীয় সংস্কার ও অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই সংগ্রাম করে আসছে। সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য পীড়ন, লাঞ্ছনা, ঈর্ষার শিকার হয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। স্রষ্টারা জরা-ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন ফিলিস্পাস অরিওলাস পারাসালসাস। পরবর্তীকালে 'পারাসালসাস' নামে খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু নয় বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও গবেষকের জন্ম হোক বার বার বার বার।

(মঞ্চে স্বাভাবিক আলো। ২ জন করে ৪ জন বালক মঞ্চে দু'দিক থেকে কলেরা ও বসন্তের জীবানু প্রতীক সেজে প্রবেশ করে।)

কলেরা : (কোরাস) গ্রাম গঞ্জ শহর বন্দর
ওলাওঠা নিয়ে চলি
এক এক করে মৃত্যু হয়
ঘর হয় খালি,
বন্ধু ঘর হয় খালি, ঘর হয় খালি।
(তীব্র হাসি)

বসন্ত : (কোরাস) ছোঁয়াচে রোগ আমি

জ্বর সহ আসি
পুঁজে ভর্তি লাল ফোসকা
ছড়াই তাড়াতাড়ি ! আহা
ছড়াই তাড়াতাড়ি।

(কোরাস উভয়) : আহা ছড়াই তাড়াতাড়ি
আহা ছড়াই তাড়াতাড়ি

(তীব্র হাসি ও প্রস্থান)

(একজন পথিক ও যাজক মন্টেস্কু সাইকেল চালিয়ে মঞ্চে প্রবেশ।)

পথিক : বলুনতো, কোনদিকে যাই, কাকে খুঁজে পাই। কত বৈদ্য কবিরেজ, কবচ-তাবিজ, উফ্ ছেলেটাকে সারানো যাচ্ছেনা। একটি কমে তো আরেকটি উপসর্গ। ও দাদা ! কোথা থেকে আসছেন ?

যোসেফ : চার্চ থেকে ফিরছি। বলুন তো, আপনাকে ভীষণ চিন্তাগ্রস্থ দেখাচ্ছে।

পথিক : দেখাবে না ? ছেলেটিকে কোনভাবেই সুস্থ করা যাচ্ছে না। অনবরত বমি, দাস্ত সঙ্গে ভীষণ জ্বর। জ্বরের মধ্যে কিসের অলৌকিক কথা বলছে - ভীষণ চিন্তা, ভীষণ-

যোসেফ : কি সব আজেবাজে চিন্তা করছেন ? গড ভাল করে দেবেন। একবার চার্চে নিয়ে আসুন, চরণামৃত খাইয়ে দেবো। দেখবেন সব শেষ, চমৎকার কি চমৎকার !

পথিক : এমন কি হয় কর্তা ?

যোসেফ : আলবৎ। গডের আশীর্ব্বাদের ওপর আর কোন ঔষধ আছে কি ? নেই, উনিই সর্বরোগের বিশল্যকরণী।

পথিক : আপনি আমাকে বাঁচালেন-বাঁচালেন কর্তা, আপনার নাম জানতে পারি ?

যোসেফ : যোসেফ মন্টেস্কু।

পথিক : যো-সে-ফ-ম-ন্টে-স্কু, নাম খুব শোনা শোনা লাগছে।

যোসেফ : সব গডের ইচ্ছে, সব গডের .....। (নীরবতা)

নেপথ্যে : পালাও-পালাও-গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কলেরা।

অন্যকণ্ঠে : বসন্ত-বসন্ত-গ্রামে গঞ্জে বসন্ত, পালাও, পালাও-

যোসেফ : এসব রোগে এতো ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ নেই। শুনুন, একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। দেশে পাপ ভর করেছে। গড, ঈশ্বর, আল্লাহের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নেই।

(এসব কথা চলাকালীন ১টি লাশ কাঁধে করে মঞ্চে তিনবার পরিক্রমা করে প্রস্থান করবে।)

পথিক : আপনি ঠিক বলছেন। গলায় যখন শ্বাসবায়ু উপস্থিত তখন বাঁচাও-বাঁচাও-

ঈশ্বর বাঁচাও।

যোসেফ : মানুষের অলৌকিক বিশ্বাসে দাঁড়ি টানছে বিজ্ঞান, শিক্ষা। মানুষকে এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। চলুন আপনার বাড়ি চলুন।

(উভয়ে ধীর গতিতে মঞ্চ ত্যাগ করে ও মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।)

দৃশ্যান্তর

(মঞ্চে স্বাভাবিক আলো, কাপড়ে ঢাকা অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে মা কান্নাকাটি করছে, এমতাবস্থায় পিতার প্রবেশ।)

পিতা : শুনি - তোমার কান্নাকাটি থামাবে ? না, করেই যাবে। দু'দজন বৈদ্য, কবিরাজ দেখিয়েছি, ঝাড়, ফুঁ, কবচ-তাবিজ দেয়া হয়েছে। একটু ধৈর্য্য ধর রোগ সেরে যাবে।

মা : তোমার শুধু ধৈর্য্য, ধৈর্য্য আর সেরে যাবে। দুটো ছেলে খুইয়েছি আর বাকী থাকল কি ? যাও তাড়াতাড়ি যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসো। যাও যাও।

পিতা : ডাক্তার ! তোমার মাথা খারাপ ? গ্রামের লোক আমাকে এক ঘরে করে দেবে। শেষ পর্যন্ত নির্বাসন। না-না-না-না আমার দ্বারা এ হবে না।

মা : হবে না মানে ? তাহলে আমি এখানে মাথা ঠুকে মরবো-মরবো-মরবো-

পিতা : যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি, তোমাকে মরতে হবে না।

(প্রস্থান ও পারাসালসাসকে নিয়ে প্রবেশ।)

পিতা : আসুন, ডাক্তারবাবু আসুন। আমার ছেলেকে একটু ভাল করে দেখুন।

পারা : (ছেলেকে ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ঔষধ খাইয়ে প্রেসক্রীপসন হাতে তুলে দেন।) রোগীর খুব খারাপ সময় চলছিল, সেরে যাবে, ভয়ের কারণ নেই।

পিতা : (ডাক্তারের ফি বাবদ সামান্য টাকা হাতে তুলে দেন) ধরুন, ডাক্তারবাবু ধরুন।

পারা : এতে হবে না আর কিছু দিতে হবে।

পিতা : আমার কাছে আর নেই ডাক্তারবাবু।

পারা : নেই বললে কি হবে ? আর কিছু গারলেন (টাকা) দিতে হবে।

মা : রক্ষা করুন ডাক্তারবাবু রক্ষা করুন।

পারা : ঠিক আছে, (একটি ঔষধ হাতে দেন) বাকী ঔষধ কিনে খাওয়ান।

(পারাসালসাসের প্রস্থান। মা প্রতীকী ঔষধ খাওয়ান। অসুস্থ ছেলেটি উঠে বসে এদিক ওদিক তাকায়।)

মা : দেখলেন - দেখলেন ছেলেটি ভাল হয়ে গেছে। একদম ভাল হয়ে গেছে। জয় ডাক্তারের জয় - জয় ডাক্তারের জয়।

পিতা : জয় নয় ! ভয়, ডাক্তারের ভয় (২) তুমি কি মনে করো ডাক্তারের চিকিৎসায় তোমার ছেলে ভাল হয়েছে। ভুল আলবৎ ভুল। যোসেফ মন্টেস্কু না থাকলে ভালই হত না। ডাক্তার যা করেছে সব লোক দেখানো। বলে আরো টাকা চাই। বেশী টাকা। দেখাচ্ছি মজা, আমি আইনের দ্বারস্থ হবো, ডাক্তারকে উচিৎ শিক্ষা দেবো। উচিৎ শিক্ষা। হাঃ হাঃ হাঃ (প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে মঞ্চে আলো কমে আসে।)

দৃশ্যান্তর

(আদালত। মঞ্চে স্বাভাবিক আলো, তিনজন ছেলে মিলে একটি কাঠগড়া তৈরী করছে। মঞ্চে থাকবে পেয়াদা, বিচারক, উকিল।)

পেয়াদা : পারাসালসাস হাজির হো - আসামী পারাসালসাস হাজির হো - (প্রস্থান) পারাসালসাস কাঠগড়ায় উপস্থিত হন।

বিচারক : আদালতের কাজ শুরু হোক।

উকিল : (পারাসালসাসকে নির্দেশ করে) উনি হচ্ছেন একজন বৈজ্ঞানিক, ভণ্ড চিকিৎসক (চেহারায় ভর্ৎসনার ভাব) ছয় গারলেন- এ তিনি সন্তুষ্ট নন, আরো চাই আরো -

বিচারক : পরিষ্কার করে বলুন।

উকিল : (পারাকে নির্দেশ করে) আপনার নাম বলুন।

পারা : ফিলিম্পাস অরিওলাস পারাসালসাস।

উকিল : ঠিক বলছেন ? আমি যতদূর জানি আপনার নাম হোয়েনহেইম। মহামান্য - উনি পিতার দেয়া নাম অস্বীকার করে দু'নম্বরী নাম রেখেছেন। যার অর্থ 'পারা' মানে 'মহান' রোমের একজন বিখ্যাত ডাক্তার যিনি যুক্তিহীন কিছুই মানতে চান না। (অট্টহাসি...)

বিচারক : অর্ডার-অর্ডার-অর্ডার। বলুন অপরাধ কি ?

উকিল : মহামান্য, তিনি একটি ছেলেকে চিকিৎসা করে ছয় গারলেন পেয়েও সন্তুষ্ট হননি। আরো চাই আরো। তাছাড়া রোগীর পিতার অভিযোগ, উনার চিকিৎসায় ছেলেটি মোটেই ভাল হয়নি, হয়েছে যোসেফের চিকিৎসায়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এসব কি মহামান্য ?

বিচারক : আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হল। (পারাকে নির্দেশ) পারাসালসাস কিছু বলতে পারেন।

পারা : মহামান্য, বিচারের নামে এসব কি হচ্ছে ? ভণ্ড বৈদ্য, আফিংখোর চিকিৎসক, ওঝা যারা দিনের পর দিন মানুষ ঠকিয়েছে তাদের আমি উচিৎ শিক্ষা দিয়েছি। আমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমি জানি

একমাত্র পরজীবীর আক্রমণেই এসব রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়। আর-বলেছেন অর্থের কথা। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে আমি কমই চেয়েছি। বিচারের নামে এইসব তামাসা বন্ধ করুন।

উকিল : আপনি বিচার ব্যবস্থাকে অবমাননা করছেন।

পারা : না, একদম না। যে বিচারব্যবস্থা ঔষধ ব্যবসায়ীদের অঙ্গুলী হেলনে চলে, এসব তাদেরই তাঁবেদারি ছাড়া কিছু নয়।

উকিল : থামুন। মহামান্য ওকে উচিৎ শিক্ষা দিন, উচিৎ শিক্ষা।

বিচারক : আগামী ৯ তারিখ বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হবে। আজকের মতো সমাপ্ত।

(মঞ্চে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে)

নেপথ্যে ঘোষণা

ভণ্ড চিকিৎসকদের বার বার আঘাত করায় পারাসালসাস আর বাসেলে থাকতে পারেননি। ডাক্তাররা সহ্য করতে না পেরে দলে দলে মিটিংয়ের পর মিটিং করতে শুরু করলেন। উনি রাজদ্রোহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

(আবছা আলোয় পারাসালসাস মঞ্চে বই হাতে নিয়ে পায়চারি করছেন।)

নেপথ্যে বলা হবে

পারাসালসাস আপনার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী হয়েছে। আপনি পালান-পালান।

(পারাসালসাস ইতঃস্তত বইপত্র নামিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করেন।)

ঘোষণা শুরু

১৬শ শতাব্দীর কোন একদিনে তিনি গোপনে গা ঢাকা দিয়ে দেশান্তরী হলেন। না খেয়ে খেয়ে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। লজ্জা ঢাকতে একচিলতে কাপড় উনার জোটেনি। এমন চরম পরিণতির পরও তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন স্নায়ুঘটিত অসুস্থতার মূল কারণ ভৌত বিভ্রাট যা পরবর্তীকালে শল্য চিকিৎসায় নব যুগান্তর এনেছিল।

(মঞ্চে আলো স্বাভাবিক হয়। চারজন বালক যথাক্রমে ঔষধ ব্যবসায়ী, ডাক্তার, যাজক, রাজকর্মচারী হয়ে মঞ্চে উপস্থিত। বৃদ্ধ পারাসালসাস লাঠি ও ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে।)

পারা : এখানে কে আছেন ? আমাকে সামান্য ভিক্ষে দিন, ভিক্ষে। কতোদিন ধরে খেতে পারছি না। ভিক্ষে দিন- সামান্য ভিক্ষে ..... (বলতে বলতে ব্যবসায়ীর সামনে) মহাশয়, আপনার ঔষধ ব্যবসা নিয়ে আর কিছু বলবো না। আপনি যা ইচ্ছে ব্যবসা করুন, আমাকে সামান্য ভিক্ষে দিন.....ভিক্ষে।

ব্যবসায়ী : কিসের ভিক্ষে। আমার কাছে কোন ভিক্ষে টিক্ষে নেই। যা শালা, না খেয়ে

মরগে- মরগে। (অট্টহাসি)

পারা : (যাজকের সামনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে উপস্থিত) মান্যবর আপনি বুঝি ধর্মীয় যাজক ? আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ডাইনীবিদ্যা শিক্ষা দিন। অভূক্ত থাকতে থাকতে আমি আর সহ্য করতে পারছিনা - আর পারছিনা (কণ্ঠে কান্নার আবেশ) আর পারছিনা।

যাজক : ধর্মের মস্তক মুন্ডন করে এখানে কি করতে এসেছিস ? যা আস্তাকুঁড়ে মরগে-মরগে। (লাথি। পারাসালসাস মঞ্চে পড়ে যান।)

পারা : (দাঁড়িয়ে, রাজকর্মচারীর কাছে) আমি দিনের পর দিন ভুল করেছি মান্যবর। আমাকে ক্ষমা করুন, আমার, আমার দেশ মহান দেশের বিচার ব্যবস্থা ন্যায় সঙ্গত, দয়া করে আমাকে একটু থাকতে দিন, একখণ্ড বস্ত্র দিন, আমি দীন দরিদ্র, খাদ্য নেই, কাপড় নেই, থাকার জায়গা নেই।

কর্মচারী : হাঃ-হাঃহাঃ- এতদিন পর ভিক্ষার শিক্ষা হল। পারাসালসাস এদেশে তোমার কোন স্থান নেই, নরকে যাও, নরকে। (ধাক্কা দেন)

পারা : (ডাক্তারের কাছে) মহাশয়, আমি না খেয়ে মরছি, আপনি তো ডাক্তার ? সামান্য ভিক্ষা দিন। আপনারা যেভাবে চিকিৎসা করছেন এর তুলনা নেই, এর তুলনা নেই। আপনাদের মত ডাক্তারি আমাকে শেখান।

ডাক্তার : ডাক্তারি ! (হাসি) যা রাস্তায় পড়ে মরগে, আমাদের ওপর খবরদারি, হুঁ খবরদারি, কোন সাহায্য নেই। যা জাহান্নামে মরগে। (লাথি)

কোরাস : শালাকে মারো-মারো (পারাসালসাস মাটিতে লুটোপুটি খেতে থাকেন, এমন অবস্থায় দুজন লোকের প্রবেশ।)

১ম ব্যক্তি : থামুন, থামুন, থামুন। (সবাই থামে ও দৃশ্যটি ফ্রীজ হয়)

২য় ব্যক্তি : উনি সেই মহান বৈজ্ঞানি, চিকিৎসক, মহান গবেষক পারাসালসাস। ১৪শ শতকের যে আবিষ্কার বিংশ ও একবিংশ শতকের চিকিৎসক, গবেষকদের কাছে নতুন দিক্ নির্দেশ করেছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উনার সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত।

১ম ব্যক্তি : বিশ্বখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউন পারাসালসাস সম্পর্কে বলেছিলেন - "But after, they will know me..... I shall emarge one day."
(কিন্তু আমাকে তারা জানবার পরই, যে আমি একদিন জেগে উঠব। তিনি জেগেই উঠলেন।)

হরগৌরীর সংসার

▣ রনজিৎ পুরকায়স্ত

প্রথম দৃশ্য

[ওস্তাদ হর ঢোল কাঁধে মঞ্চে আসে। চড়কের উপযোগী কিছু কসরৎ করতে থাকে ছেলে-মেয়েরা]

ওস্তাদ : ধন্য ধন্য তুমি ভোলানাথ শিব
তিরুপতি নামে জানে দক্ষিণের জীব
উত্তরেতে কেদারনাথ সর্বলোকে পূজে
তারকনাথ নামে তোমায় চেনে যে পুবে
উত্তর পুবের এই পার্বতি রাজ্য
বুড়া শিব বলে জানি মোরা অনিবার্য
চৈত্র সংক্রান্তিতে করিব চড়ক
দেশ হইতে দুর হইব মারি মহামড়ক

সকলে : বাঃ বাঃ

ওস্তাদ : সখী চল দেখি গিয়া ..... (গান)
গিরিপুরে মহাদেবের মুখচন্দ্রিকার বিয়া।।

(নৃত্যগীত শেষ হলে সবাই হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত)

ওস্তাদ : হাসিয়া সময় নষ্ট করিও না। সামনে চড়ক। ওখন থাকি রোজ মহড়া লাগব। ও বা সুবল তুমি আবার গতবারের মতো পিছলাইয়া পড়ি যাইও না।

(সবাই হাসে)

সুবল : না না ইবার পড়তাম নায় ওস্তাদ

ওস্তাদ : ইবার কিতা মাইয়্যা লোকের চড়ক হইত না কিতা।

রীনা : আরে না না আমরা এমনেউ কররাম। ওস্তাদ আমরা ই পূজা কেনে সাতপুরুষ ধরিয়া করি আরতো কেউ করেনা ?

ওস্তাদ : করে না, তোমারে কে কইলো এক এক যেগায় এক এক নাম। আমরার ই দেশে এক বিরাট মিল আছে রে, কিন্তু নাম আলাদা। কেউ করে নীলের পূজা, কেউ করে গাজন, কেউ বৈসাখী, কেউ ওনাম, কেউ বিহু লক্ষ্য দেশের মানুষের কল্যান।

গৌরী : সারাদিন চড়ক লইয়া বই থাকলে অইব নি। তোমরারও কোন কাজ কাম নাই নি। যাও চাইন বাড়ি ঘরো।

(সবাই উঠে চলে যায়)

হর : কিতা গো, আকতা ই ছলল্যায় কেনে, কত শখ করিয়া ওস্তাদের উঠানো বইছে হকলে, কত গফ জমছিল, দিলায় তো জল ঢালিয়া।

গৌরী : গফে বাত দিব নি। দুই দিন পরে সবে সন্ন্যাস লইবায় ১ মাসের লাগি। তখন আমরা মা-বেটি খাই কিনা খবর লও নি। অখন অন্ততর একটু চাউলের ব্যবস্থা কর।

হর : কিতা ! চাউলর ব্যবস্থা ! সামনে চড়ক আমার মাথাত অখন কই থাকি আনতাম পতিত ব্রাহ্মণ, কারে সন্ন্যাস বানাইতাম, বালা এগু ঢোল বাজাউরা নাই, হিগুরে কই থাকি যোগাড় করতাম অতা চিন্তায় মাথা আউলা লাগি রইছে।

গৌরী : তে খাইতায় নায় তো আইজ।

হর : ইস্ আমার মাথা খাইয়ো না। একদিন দেখবায় নিমাইর মতো আমিও সংসার ছাড়ি যাইমুগি। গান ..... নিমাই আমার সন্ন্যাসে যায় মাকে ছাড়িয়া।

(প্রস্থান)

গৌরী : ঠাকুর হে বুড়া শিব একটু মতি গতি ফিরাও ই ওস্তাদর ঔ যে গেল আর তো গিলিয়া আইব। ঠাকুর বাঁচাইয়া রাখিও।

(প্রস্থান)

(লাইট অফ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সুবল বসে চড়কের দা, তরোয়াল বানাচ্ছে এমন সময় রন র প্রবেশ)

রন : সুবল দা ও সুবল দা

সুবল : রন নি বা কিতা কও চাইন

রন : ওস্তাদ কই বা, বাড়ি বাড়ি গিয়া ভিক্ষা কবে শুরু হইত

সুবল : কাইল থাকিয়া, আর নাইলে সময় কই। তে বা রন ওস্তাদে কইছইন তোমারে ইবার গৌরী বানাইতা।

রন : কি যে কও, আমার যে লইজ্জা লাগব। আর আমার পায়ে নু একটু দোষ আমি কিতা পারমু নি।

সুবল : এ পারতায় না কেনে বা ঔ তো রুমাল ধরলায় আর.....

(নেচে, গেয়ে দেখায়। শম্ভু আসে শিবের নাচ শুরু করে)

সুবল : ঔ আমরার আসল শম্ভু আইছইন। তোর ই শিবের জায়গা পাক্কা, ইটা তুই ছাড়া আর কেউ হইত নায়।

(এমন সময় দুজন শহুরে তরুণী আসে)

তরুণী-১: এই যে শুনছেন - এই দিকে ডুগলা পাড়াটা কোন দিকে ?

শম্ভু : কিতা কইলা !

তরুণী-২: না মানে চড়ক শিল্পি হরকুমার শব্দকরকে চেনেন ?

শম্ভু : কইরা শিল্পি, আবার কইরা ডুগলা পাড়া ! হায়রে ভদ্রলোক। কইন ওস্তাদের লগে কি দরকার।

তরুণী-১: না মানে সামনেই তো লোকসংস্কৃতি উৎসব তো লোকশিল্পি হিসাবে উনাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, আর উনার দলের গাজন নৃত্য পরিবেশন করার নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিলাম।

শম্ভু : ও মানে আর একবার গাড়ি ভর্ত্তি করি শহরে যাওয়া, বাবুরারে নাচ দেকানি আর

মিষ্টির প্যাকেট লইয়া খুশি হইয়া বাড়িত।

সুবল : ইশ্ তুই বেশি মাতচ, দেইন দিদিমনি চিঠি ওটি কুনতা এনেছেন। ইগুর মাতে কোনতা মনে করবেন না।

তরুণী-২: না না, ঠিক আছে, এই নিন (চিঠি দেয়)। আর শুনুন আমাদের স্কুটিটা একটু ধাক্কা দেবেন। যা নোংরা রাস্তা আর চারিদিকে যা অবস্থা।

সুবল : ঠিক আছে, ঠিক আছে চলুন না কি করতে হবে।

(সুবল ও তরুণীদ্বয়ের প্রস্থান)

শম্ভু : হায় রে, লোকসংস্কৃতিরে বাঁচাইবার লাগি সরকার, শিক্ষিত মানুষ কত চেষ্টা করের অথচ ছোটলোক, ডুগলা পাড়া, ঢুলিপাড়া ই শব্দটি তো মন থাকি ফালাইতায় পারলায় না।

(লাইট অফ)

তৃতীয় দৃশ্য

(দা হাতে নণি চড়কের মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে এমন সময় ওস্তাদ আসে।)

ওস্তাদ : বাঃ ঔতো তুই পারচ, দেখি দাটা দে চাইন। শম্ভু এদিকে আয়চাইন।

(শম্ভু আসে, দা ধরে ওস্তাদন নণিকে দা তে ওঠতে বলল, নণি ভয় পেয়ে পড়ে যায়)

নণি : ই প্রত্যেক বছর বর্শি গাথা, দা খেলা, শিক গাথা অতো কষ্ট ভালালাগেনা।

ওস্তাদ : কস কিতা ইটা আমরার ধর্ম।

নণি : ধর্ম তো ঠিক, কিন্তু অত বীভৎসতা যে ধর্মে এই ধর্মটারে বদলানি যায়না

ওস্তাদ : না যায়না বাপ-ঠাকুরদার আমল থাকি চলিয়াআর দেশের মানুষের রোগ-শোক দূর করার প্রার্থনা করি আমরা সবের দুঃখ দূর হউক আমারে যত কষ্ট দেও হে বুড়া শিব।

নণি : মানুষর কষ্ট দূর করি তোমার কিতা লাভ। তোমার ঘর যখন খাওয়া থাকেনা তোমারে কেউ খাওয়ায় ? তোমার ঘর বিয়ার উপযুক্ত মাইয়্যা ইগুরে বিয়া দিতায় পাররায় না টাকার লাগি কেউ সাহায্য করের ?

ওস্তাদ : করের সরকারে লোকশিল্পী হিসাবে আমারে ভাতা দের আমার মাইয়্যা যখন লেখা পড়া বাদ দিয়া ঘর তখন রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান থাকি আইয়া স্কুল নিয়া ভর্ত্তি করাইছে RSTC থাকিয়া মাধ্যমিক পাশ করাইছে।

নণি : কিন্তু এটাই কি সব, সাতপুরুষ ধরিয়া যে মানুষের মঙ্গল চাইরায় এইটার প্রতিদান কি একটা ভাতা আর মাধ্যমিক পাশ করানি।

ওস্তাদ : না সবটা নায় কিন্তু আমরা ইটা করিয়া যাইমু, কারণ আমরার সিঁড়ি বাইয়াই বাবুরা যুগে যুগে স্বর্গে উঠছে, ইটাই আমরার গর্ব। মহারাজায় শুরু করছিলা এই চড়ক এরপর থাকিয়া আইজ পর্যন্ত চলিয়া আর, সবচেয়ে ভালা যখন ভাবি আমরা মানুষের ভালা চাইরাম তখন সব কষ্ট দূর হই যায় রে।

নণি : একবারে নু বুলে ব্রিটিশ সরকারে এই চড়কপূজা, বর্শি গাথা, শিখ গাথা বন্ধ করি

দিছিল।

ওস্তাদ : ওয় ইতা বুলে বর্বরতা, এরলাগি বন্ধ, কিন্তু আমরার বাপ-ঠাকুরদায় মানছইন না। আর সাহেব ইটা ভারতবর্ষ, পৃথিবী খুঁজিয়া এমন দেশ পাইতায় নায় যেখানে মানুষ মানুষের কল্যাণের লাগি বরত, উপাস, কৃচ্ছ সাধন করের। ইতা বিলাত খুঁজিয়া পাইতায়।

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী : ইতা মাতিয়া পারতেনায় রে রন, বড় সরল এই মানুষটি হিংসা নাই, চাওয়া নাই, একবেলা পান্তাভাত জুটলেই খুশি। বৌ বাবুর বাড়ি কাম গেলোগি আর এরা বাজনার বায়না পাইলে বাজাইলো নায় সারাদিন চড়কের কথা ভাবলো, ঘর জোয়ান মাইয়্যা কেমনে বিয়া দিত কোন চিন্তা নাই। (কান্না)

ওস্তাদ : চিন্তা আছে, দেখিও ইবার চড়কের পরই পাত্র লইয়া আইমু।

(নণিকে ইঙ্গিত করে নণি লজ্জা পায়)

গৌরী : আর তুমি আনছ

ওস্তাদ : গান ধরে ..... গৌরী সাজাইয়া দাও মোরে মা মেনাকা

(স্কুল থেকে মেয়ে বেলা ও তার বান্ধবী রীনা আসে)

ওস্তাদ : কিতাগো স্কুল থাকি আইগেছো নি আইতে অত দেরি কেনে।

(বেলা কাঁদে)

ওস্তাদ : কিতা হইছে রে আমারে কে কিতা কইছে, রীনা কও চাইন দেখি কিতা হইছে।

রীনা : না মানে বিশু মাহাজনের পুলা স্বপনে কইছিল বেলারে বিয়া করব আর আজকে স্কুল যাওয়ার সময় গাড়িত উঠাইয়া কই লইয়া গেছে, অখন আনিয়া দিয়া গেছে। তাইর সর্বনাশ করিলাইছে। (সবাই কাঁদে, ইথারে বাজছে সখি চলো দেখি গিয়া)

ওস্তাদ : তাইরে লইয়া ঘর যাও, নণি দা দে

নণি : ওস্তাদ ! দে .....

দা নিয়ে চড়কের খেলা শুরু করে গান ধরে .....

রাজার প্রাণ কাঁপে ডরে
অসুরের ও মুন্ডমালা শশ্মান কালির গলে।।

(শুরু হয় কালি, শিব, অসুর নৃত্য যা অসুর দমনের দ্যুতক ওস্তাদ পাগলের মতো ঢোল বাজায়, কালি অসুর বধ করে উন্মাদিনীর বেশে বেলার প্রবেশ)

ওস্তাদ : কালি রে নম দে, সব পাপ দূর হইব।

বেলা : আর কতদিন তুমি অসুর বধ করতায়, ই অসুরের জাত কি ফুরায় না নি আমরা দেশের মানুষের মঙ্গলের লাগি অত কিছু করি কিন্তু আমরার মঙ্গল হইব কোনদিন।

(চড়কের বাজনা বাজে শুরু হয় চড়ক মেলা)

---------- যবনিকা ----------

★★★★★

Start believe in your

SELF

Not on Demons like

BABA

Growing SEED

"Live peacefully and let live others peacefully"

Dharmanagar, Tripura North
Pin : 799250

haploids advertising.com